সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

আগস্ট ২০১৭

ঢাকায় হাই কমিশনারের কর্মব্যস্ততা...

০১. ৭ জুলাই ২০১৭ নতুন দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির সঙ্গে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশী কূটনীতিকদের জন্য আয়োজিত বিশেষ কোর্সে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী অফিসার্স ট্রেইনিদের সাক্ষাৎ

০২. ১৪ জুলাই ২০১৭ বঙ্গভবনে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনার সম্মানে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ আয়োজিত নৈশভোজে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

০৩. ৯ জুলাই ২০১৭ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সঙ্গে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাক্ষাৎ। এসময় স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন

০৪. ৯ জুলাই ২০১৭ ভারতীয় বণিক সমিতি (আইসিসি) আয়োজিত কৃষি-পণ্য ক্রেতা-বিক্রেতা সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ঢাকায় আগত আইসিসি কর্মকর্তা ও মহারাষ্ট্র আঙুর উৎপাদক সমিতির সভাপতি ও সদস্যদের সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাক্ষাৎ

০৫. ১৩ জুলাই ২০১৭ ঢাকার বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে বিল্ডকন ২০১৭ এবং বাংলাদেশ উড ২০১৭-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি হাই কমিশনার ড. আদর্শ সোয়াইকার যোগদান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ। পিএইচডি শিল্প ও বণিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়া প্যাভেলিয়নে ৬০টি ভারতীয় কোম্পানি অংশগ্রহণ করে। প্রদর্শনী চলে ১৫ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত

০৬. ২১-২৪ জুলাই ২০১৭ ন্যাশনাল মেরিটাইম ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন নৌবাহিনি প্রধান এডমিরাল আর কে ধাওয়ান পিভিএসএম, এভিএসএম, ওয়াইএসএম (অব.)-এর বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির সেমিনারে যোগ দিতে ঢাকা আগমন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ পঁয়তাল্লিশ | সংখ্যা ০৮ | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৪ | আগস্ট ২০১৭

Website: **www.hcidhaka.gov.in**
/IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

টুইটার কূটনীতি
পৃষ্ঠা: ০৮

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	এনডিসির সভায় শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বক্তৃতা	০৪
	'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' শিক্ষামেলায় হাই কমিশনার	০৭
বিশেষ নিবন্ধ	টুইটার কূটনীতি ॥ বিনীতা পান্ডে	০৮
	ই-গভর্ন্যান্স ॥ আর এস শর্মা	১০
উচ্চশিক্ষা	বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ	১৩
প্রবন্ধ	কালিদাসের মেঘদূত ॥ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়	১৪
	রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনা ॥ দীপিকা ঘোষ	২১
উৎসব	ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসব ॥ সেলিনা হোসেন	১৮
কবিতা	সোহরাব পাশা ॥ মাহমুদ কামাল ॥ মোয়াজ্জেম হোসেন রবীন্দ্রনাথ অধিকারী ॥ সোহরাব পাশা	২৪
	সুজন হাজারী ॥ ফকির ইলিয়াস ॥ শেখর দেব সন্তোষ ঢালী	২৫
ভ্রমণ	গান্ধীজীর দেশে আমরা ॥ নওশাদ জামিল	২৬
ছোটগল্প	কথোপকথন ॥ নাসরীন মুস্তাফা	৩১
অনুবাদ গল্প	ছেঁড়া জুতো ॥ জ্ঞানী গুরমুখ সিং মুসাফির	৩৫
ধারাবাহিক	তর্পণ ॥ ঋতা বসু	৩৭
রাজ্য পরিচিতি	ওড়িশা	৪১
রান্নাঘর	ওড়িশার রান্না	৪৬
শেষ পাতা	আজন্ম বিদ্রোহী কবি	৪৮

১৮ থেকে ২০

ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসব

২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে গুয়াহাটিতে যখন পৌঁছুই তখন বিকেল শুরু হয়েছে মাত্র। চারদিকে ঝকঝকে রোদ। মাঘের শীতের দাপট নেই। এ সময়ে আসামবাসীর আছে মাঘ-বিহু। রাজ্যজুড়ে পালিত হয় বড়সড় আকারের পিঠাপুলির উৎসব। আগে যখন আসামে এসেছি তখন এ উৎসবের পিঠা খেয়েছি। উৎসবের আনন্দ আর বৈচিত্র্যে ভরে ছিল মন। এবারে বাংলাদেশ থেকে আমি আর শাহীন আখতার এসেছি আরেকটি উৎসবে যোগ দিতে। উৎসবের নাম ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসব। প্রথমবারের মত এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে ২৮, ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে।

সম্পাদক **নান্টু রায়**
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. জিলানী চৌধুরী

মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ৯৫৬৩৫৭৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর **ভারতীয় হাই কমিশন**
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

অনেক প্রতীক্ষার পর

প্রিয় ভারত বিচিত্রা,

অনেক প্রতীক্ষার পর তুমি এলে। বৈশাখে যখন সবুজ পাতার ফাঁকে কৃষ্ণচূড়া লাল... অনেক দিন পর হাতে পেলাম চিরবাঞ্ছিত তোমাকে– *ভারত বিচিত্রা*। আমার গ্রাহক সংখ্যা ১৮৯।

তোমার প্রতিটি পাতায় পাতায় মানবতার অমর আলোক– কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়েছে। প্রাপ্তি স্বীকার করব করব করেও অনিবার্য ব্যস্ততায় হয়ে ওঠেনি। বিবেকের অদৃশ্য পোঁকা কুরে কুরে খাচ্ছিল দীর্ঘদিন। অবশেষে একসঙ্গে চারটি সংখ্যার প্রাপ্তি স্বীকার। ফেব্রুয়ারি থেকে প্রথম সংখ্যা হাতে।...

এক.

তোমার 'ফেব্রুয়ারি' শরীরে তথ্যনির্ভর অগুনতি স্বপ্নের সমাবেশ। রঙ-বেরঙের বাতি জ্বেলে দিলে চৈতন্য আঙিনায়। বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের প্রথম পদক্ষেপ আমাদের অহংকার একুশকে নিয়ে সাদামাটা কথায় সম্পাদকীয়টুকু ভাল লেগেছে। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকে নিয়ে মাহবুবুর রহমানের স্মৃতিচারণ যথার্থ মনে হয়েছে। বাংলাদেশী ভ্রমণকারী ও শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যনির্ভর দিক- নির্দেশনা কাজে লাগবে। ছোটগল্পগুলো পড়ে অতৃপ্ত রয়ে গেছি। হিমাদ্রিশেখর সরকারের দুই বাংলার মানুষের মিলন মেলার শেকড়-সন্ধানী প্রয়াস আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে– খানিকটা স্মৃতিকাতরও। আমাদের প্রতিবেশী 'মণিপুর' রাজ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা তথ্যবহুল পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরায় অনুবাদক মানসী চৌধুরী ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। অমিতাভ ঘোষ 'খাজুরাহো' ভ্রমণে ঐতিহ্য ইতিহাস শিল্পকর্মকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

দুই.

তোমার 'মার্চ-এপ্রিল' সংখ্যার প্রচ্ছদ লোকগানের ভাণ্ডারী পরলোকগত কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মরণে। মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের 'সীমার মাঝে অসীম তুমি'তে পারিবারিক পরিমণ্ডলে কালিকার শৈশব-কৈশোর যৌবনের স্মৃতি পড়ে ঋদ্ধ হয়েছি। ছোটগল্পে এবারও অতৃপ্তির ছোঁয়া। তবে কবিতাংশ সমৃদ্ধ মনে হয়েছে। ধারাবাহিক রাজ্য পরিচিতিতে এবার 'নাগাল্যান্ড'-এর ঐতিহ্য-প্রথা-ভাষা-পোশাক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। মো. আল আমিনের 'বাংলা কবিতায় নববর্ষ' গতানুগতিক। শামসুন নাহার জামানের মনসা মঙ্গলের 'বেহুলা' বহুল চর্চিত।

তিন.

তাৎপর্যপূর্ণ প্রচ্ছদ নিয়ে সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ সোনালি অধ্যায়ের সূচনা তোমার 'মে' সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শ্রুতি নাহা সেন ও জামিরুল ইসলাম শরীফের বৈচিত্র্যধর্মী নতুন মূল্যায়ন নতুন ভাবনার উদ্রেক করে। শিমুল আজাদের নজরুল প্রতিভার কথা নতুন অর্থবাহী। বিরজু মহারাজ সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা ক্ষমাহীন– কিছুটা হলেও পূর্ণতা পেল। রাজ্য পরিচিতিতে 'অরুণাচল'-এর দুর্গম দুর্ভেদ্য জীবনযাপন পদ্ধতি বিস্ময়ের জন্ম দেয়। কবিতাংশ সময়োপযোগী ও মূল্যবান।

চার.

'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' ২০১৭ জুনে বিশেষ যোগ সংখ্যা ছোটগল্পবিহীন। যোগ সাধনার বহুমুখী তাৎপর্য ও রোগ নিরাময়েরর বিস্ময়কর ক্ষমতা চমকে দেবার মত। যোগ সাধনা সম্পর্কে এতদিন একধরনের উন্নাসিক মনোভাব ছিল আমাদের সমাজে, সে ভুল একটু হলেও ভেঙেছে। নিজেকে ঋদ্ধ করার প্রেরণা পেয়েছি। নিরীক্ষাধর্মী কবিতা প্রয়াস সময়োপযোগী। প্রমথনাথ বিশী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাই।

পরিশেষে, প্রতিটি সংখ্যার অসাধারণ প্রচ্ছদ, অতুলনীয় অঙ্গসজ্জা উন্নতমানের কাগজ দীর্ঘদিন সঞ্চয়ে রাখার মত।

তোমাকে শুভেচ্ছা হে ভারতবর্ষ। নিরন্তর শুভকামনা, হে প্রতিবেশী সখা পশ্চিমবঙ্গ। অভিনন্দন তোমাকে হে *ভারত বিচিত্রা*। ভাল থাকে যেন তোমার সকল সন্তান।

নিরঞ্জন মন্ডল
গ্রাম- বেতকাটা, ডাকঘর- ভোজপাতিয়া
রামপাল, বাগেরহাট

আগ্রহ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জার্নাল রুমে *ভারত বিচিত্রা* নামে পত্রিকাটির সন্ধান লাভ করি। একটি আলাদা তাকে পত্রিকাটির বেশ কয়েকটি সংখ্যা থরে থরে সাজানো দেখতে পেয়ে বের করে পড়তে শুরু করি। পত্রিকাটি পাঠের মাধ্যমে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারত সম্পর্কে বেশ কিছু অজানা তথ্য জানতে পারি। এতে করে আমার আগ্রহ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। পত্রিকাটি আমি নিয়মিত পেতে এবং সংগ্রহে রাখতে চাই। নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্রিকাটি পাঠালে কৃতার্থ হব।

আরাফাত শাহীন, দ্বিতীয় বর্ষ (সম্মান)
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫

অনলাইন পাঠক

আমি *ভারত বিচিত্রা*র একজন অনলাইন পাঠক, মূলত আমি পিডিএফ ভার্সনে পত্রিকাটি পড়ে থাকি। বর্তমানে আমি আমার স্কুলের পাঠাগারে পত্রিকাটির কপি সংগ্রহ করতে চাচ্ছি, সেটা কি আদৌ পাওয়া সম্ভব? আশা করছি পত্রিকাটির হার্ড কপি পাব।

মুহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক
এস এ চৌধুরী ইনস্টিটিউট, মছজিদ্দা, কুমিরা
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মাননীয় ভারতীয় হাই কমিশনারসহ ভারতীয় হাই কমিশনে কর্মরত সকলকে আমার আন্তরিক প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভারতবাসীদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভ কামনা। দুই দেশের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক সভ্য সাংস্কৃতিক সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধন।

১৬ মার্চ ২০১৫ ভারতীয় হাই কমিশনের নিয়মিত প্রকাশনা *ভারত বিচিত্রা* জানুয়ারি ২০১৫ সংখ্যাটি

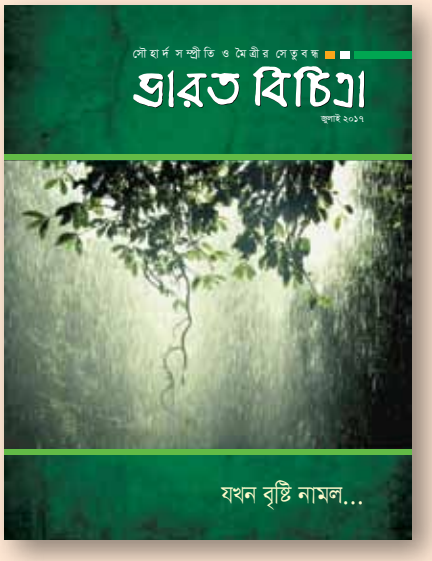

ডাকযোগে পেয়েছি। এজন্য নিজেকে গর্বিত ও আনন্দিত মনে হচ্ছে। আপনাদের প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রা* পড়ে অনেক কিছু অবগত হলাম, জানলাম ও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিধি বাড়ালাম। আপনার সম্পাদনায় প্রচ্ছদ ও লেখক-লেখিকাদের গল্প প্রবন্ধ কবিতা ঐতিহাসিক বিষয়গুলো পড়ে খুবই মুগ্ধ হলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে একইভাবে আপনার *ভারত বিচিত্রা* ও আপনাদের সব অনুষ্ঠানে আমাকে পাশে রেখে চির কৃতজ্ঞতা ও মুগ্ধতাপাশে আবদ্ধ করে বাধিত করবেন।

এ টি এম এ মোহিত অনু
চিত্র নির্মাতা, টুইনক্কেল মাল্টিমিডিয়া, ঢাকা-১২০৩

বিষয়টি খতিয়ে দেখে

আমি *দৈনিক বিষাণ*-এর বার্তা সম্পাদক। অনেকদিন যাবৎ আপনার সম্পাদিত *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পেতাম। কিন্তু বিগত বছরের শেষ থেকে বর্তমান বছরের মার্চ পর্যন্ত নিয়মিত পাচ্ছি না।

সম্ভবত কোন কারণবশত আমার ঠিকানায় আপনাদের পত্রিকা আসছে না। অনুগ্রহ করে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুনরায় আমার ঠিকানা নিয়মিত আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকাটি প্রেরণ করে বাধিত করবেন।

নূর মোহাম্মদ নূরু
বার্তা সম্পাদক, দৈনিক বিষাণ
৭/৭, আলী এ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট (৪র্থ তলা)
সাত মসজিদ, বসিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

লাইব্রেরির জন্য

বাংলাদেশের উত্তরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে শেরপুর জেলা অবস্থিত। এখানে অনেক সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় বসবাস করে। আমরা জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছি। উক্ত লাইব্রেরির জন্য আপনার বহুল প্রচারিত *ভারত বিচিত্রা*র একটি সৌজন্য কপি প্রয়োজন।

অতএব, উল্লেখিত লাইব্রেরির অনুকূলে ১ কপি *ভারত বিচিত্রা* পাঠাবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

মলয় চাকী, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, শেরপুর জেলা শাখা
চাকী বস্ত্রালয়, নয়ানী বাজার, শেরপুর-২১০০

ইংরেজি বর্ষপঞ্জির আগস্ট মাস এলে নানা ঘটনার আবহে মন দুলে ওঠে। প্রথম অনুষঙ্গ যদি হয় বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল কবির মৃত্যু, তাহলে দ্বিতীয় ঘটনা অবশ্যই দ্বিধাবিভক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা এল বিপুল রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে... পাঞ্জাব আর বাংলাকে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে। গান্ধীজী প্রতিবাদে নোয়াখালিতে চলে এলেন, গ্রামে গ্রামে প্রার্থনাসভা করলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ স্বাধীনতা ঘোষণার মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি অভিমানে পড়ে রইলেন কলকাতায়। ভারতভাগ তিনি মানতেই পারেননি আদপে। কিন্তু তবু স্বাধীনতা এল... দীর্ঘ দুশো বছরের গোলামির জিঞ্জির ভেঙে যে স্বাধীনতা এল, তাকে তো বরণ করে নিতেই হয়। তাই ১৫ আগস্ট সকল কান্না ছাপিয়ে মানুষের মনে বাঁধভাঙা আনন্দের জোয়ার আছড়ে পড়ল। সেদিন যে ভারতের জন্ম হয়েছিল, সেই নবীন রাষ্ট্র আজ ৭০ পেরিয়ে ৭১-এ পা রেখেছে। আজ ভারতের স্বাধীনতা উদ্‌যাপন হচ্ছে উন্নয়নের বিবিধ মাইলফলক স্পর্শের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানে ভারতের মৌলিক অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। সামরিক উদ্ভাবন, শিল্প, কৃষি, মহাকাশবিষয়ক ফলিত গবেষণায় এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। ই-গভর্ন্যান্স এখন কল্পবিজ্ঞান নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল ভারত আজ বর্ণে-বিভায় জগতসভা আলোকিত করছে।

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 'সবার আগে প্রতিবেশী' নীতি গ্রহণের ফলে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে উৎপাদন খাতে সরাসরি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। গত দু'বছর ধরে ভারত গ্রিনফিল্ড এফডিআই-এর সর্ববৃহৎ গ্রহিতা। ২০১৬ সালে ভারত প্রায় ৬ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসেবে পেয়েছে। গত তিন বছরে, ভারতে রেকর্ড পরিমাণ ৩৭ শতাংশেরও বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগ বেড়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ভারত ঘরোয়া সংস্কার ও নীতিমালা উদার করেছে।

২০১৪ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকার ও কূটনীতিকদের সামাজিক মাধ্যমকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারে একটা বিপ্লব সূচিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই শুধু সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় নন, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামের মত মঞ্চসমূহে তাঁর সরকারের সব মহলের সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রধানমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমকে 'সরাসরি ডায়ালিং' হিসেবে ব্যবহার করেন, যেখানে সরকার তার নাগরিকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারে। ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব নিরুপমা রাও প্যারিসে ইউনেস্কোয় এক বক্তৃতায় বলেন, 'সামাজিক মাধ্যমের যুগে ডিপ্লোম্যাসি কূটনীতি ওজোন চেম্বার থেকে, এর সংরক্ষিত অতীত থেকে বেরিয়ে আন্তঃসক্রিয়, অধিকতর সংযুক্ত, অধিকতর মানবকেন্দ্রিক, মানবপ্রেমী... বিশ্বব্যাপী ভারতীয় দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনগুলি এখন ফেসবুক, ইউটিউব ও টুইটারে সক্রিয় এবং কিছুদিন আগেও যা ভারতীয় কর্মকর্তাতন্ত্রের অনধিগম্য ছিল, তা এখন অতি গম্য হয়ে উঠতে শুরু করেছে।' স্বাধীনতার সত্তর বছর পর আজ তথ্য-প্রযুক্তিক্ষেত্রে যে বিপ্লব এসেছে, তার সুফল ভারতবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

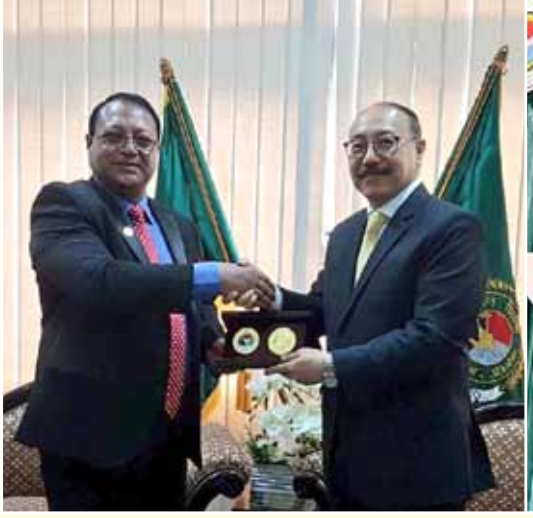

এনডিসির সভায় শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিসীম এবং এটা ধরে রাখতে আমরা পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

১৮ জুলাই ২০১৭ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে এনডিসি কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা 'সমসাময়িক ভারত, তার পররাষ্ট্র নীতি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কৌশল এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক'বিষয়ক বক্তৃতায় ভারতের বৈদেশিক নীতির সাম্প্রতিক অগ্রগতির উপর আলোকপাত করেন, যা পৃথক পৃথক- ভাবে ভারতের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা কৌশলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশে তিনি এ বছরের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের প্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সরওয়ার্দি, বীর বিক্রম, ঊর্ধ্বতন পরিচালন স্টাফ, স্টাফ সদস্যবৃন্দ ও অনুষদ এবং এনডিসি কোর্স ও সশস্ত্র বাহিনির যুদ্ধবিষয়ক কোর্সের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন কৌশল ।বষয়ে শ্রী শ্রিংলা বলেন, ভারতের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্যগুলির অন্যতম। এর অর্থ হচ্ছে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে আমাদের কর্মশক্তি উন্নয়নমুখী করা অর্থাৎ এমনভাবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা যা আমাদের জনগণের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে।

তিনি বলেন, ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে 'সবার আগে প্রতিবেশী' নীতি গ্রহণ করেছে। ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্যসমূহ প্রতিবেশী দেশগুলির পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের মধ্যে সহযোগিতার যে-সব উপাদান রয়েছে সেগুলোকে কাজে লাগানো উচিত। আমাদের পণ্য ও জনগণের নিরবচ্ছিন্ন চলাচলের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পাশাপাশি আমাদের কৌশলগত ও নিরাপত্তা স্বার্থসমূহ নিয়েও আমাদের কাজ করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে, ভারত তার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য কূটনীতিতে এক সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে উৎপাদন খাতে সরাসরি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। গত দু'বছর ধরে ভারত হচ্ছে গ্রিনফিল্ড এফডিআই-এর সর্ববৃহৎ গ্রহিতা। ২০১৬ সালে ভারত প্রায় ৬ হাজার ৫শো কোটি মার্কিন ডলার সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসেবে পেয়েছিল। গত তিন বছরে, ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগ ৩৭ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা একটি রেকর্ড। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষে ভারত ঘরোয়াভাবে সংস্কার ও নীতিমালা উদারীকরণ করেছে, ফলে তার উন্নয়নমুখী বৈদেশিক নীতি সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে কার্যকর হবে।

হাই কমিশনার বলেন, স্বাধীনতার পর ভারত ১ জুলাই থেকে সর্ববৃহৎ কর সংস্কার কার্যকর করেছে। পণ্য ও সেবা কর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার লক্ষ হচ্ছে এক জাতি-এক কর-এক বাজারের লক্ষমাত্রা অর্জন। ভারতকে একটি অভিন্ন বাজারে পরিণত করা এবং বাণিজক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাধা দূর করা এই উদ্যোগের লক্ষ। এই সংস্কার কার্যকর করায় ভারতের নীতিনির্ধারকদের প্রচেষ্টা ছিল 'ব্যবসা করা সহজ'-কে বেগবান করা।

শ্রী শ্রিংলা বলেন, 'সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কয়েকটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে স্মার্ট সিটিজ, স্কিল ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া ইত্যাদি। আমাদের বৈদেশিক নীতি প্রধান ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছে।

'বিদেশে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের কল্যাণও আমাদের কূটনীতিতে একটি নতুন মূলমঞ্চ হয়ে উঠেছে। আমাদের উভয় দেশেরই জনগণের একটি বড় অংশ বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় দেশগুলোতে অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে বসবাস ও কাজ করছে। সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময়গুলোতে আমাদের নাগরিকরা বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে ক্রসফায়ারের শিকার হয়েছে। গত তিন বছরে ইরাক, ইয়েমেন ও সিরিয়ার বিভিন্ন সংঘর্ষপূর্ণ এলাকা থেকে ৮০০০০-এরও বেশি মানুষকে সরিয়ে আনা হয়েছে এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এইসব কার্যক্রমের পুরোভাগে ছিলেন।'

হাই কমিশনার বলেন, 'অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, হতে পারে তা সন্ত্রাসবাদ অথবা জলবায়ু পরিবর্তন– বৈশ্বিক বিষয়সূচি নির্ধারণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করা আমাদের বৈদেশিক নীতির অন্যতম লক্ষ। জাতি হিসেবে আমরা পরিবেশগত সুরক্ষা ও সংরক্ষণের মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং আমরা জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ সক্ষমতা অর্জনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সৌরশক্তি প্রযুক্তির অগ্রগতি ও ব্যয় হ্রাসের মধ্য দিয়ে তা অর্জনে আমরা ভালভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি।'

সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে হাই কমিশনার বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ একটি বৈশ্বিক সমস্যা যা আমাদের সকলকে প্রভাবিত করে এবং এ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হুমকিগুলির একটি। নিরাপত্তা হুমকির বিশ্বায়ন; সন্ত্রাসী-অর্থায়ন অথবা ভৌত নেটওয়ার্ক, যা সীমানা অতিক্রম করে রাষ্ট্রগুলিকে তাদের সম্পদ সংগ্রহ এবং এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য একে অপরকে সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছে। এটি সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিশেষ অথবা আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করতে এবং জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সভা অনুমোদন ও তা দ্রুত চূড়ান্ত করারও আহ্বান জানাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কেবল সন্ত্রাসী, সন্ত্রাসী সংগঠন এবং নেটওয়ার্কগুলি ভেঙে দেয়া বা নির্মূল করাই নয় বরং যেসব রাষ্ট্র ও সংস্থা যারা সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত ও সমর্থন করেছে এবং এতে অর্থায়ন করেছে, সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছে ও তাদের গুণাবলীর মিথ্যা প্রশংসা করেছে তাদের সকলকে চিহ্নিত করা, দায়ী করা ও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে ভারতের রয়েছে শূন্য-সহনশীলতা।' তিনি এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে চমৎকার নিরাপত্তা সহযোগিতা রয়েছে। ৪ হাজারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের সীমান্ত পাহারা দিতে গিয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের প্রায়শই ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়। দুই দেশের মধ্যে স্থল ও সমুদ্রসীমানা নির্ধারণ ভারত

ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এগুলির মধ্যে ছিল সাইক্লোন মোরা-য় আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতীয় নৌবাহিনির উদ্ধার অভিযান যেখানে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রহরারত জাহাজ আইএনএস সুমিত্রা ৩২জন বাংলাদেশি নাগরিককে উদ্ধার করেছিল। হাই কমিশনার বলেন, 'গত বছর আমাদের উপকূলরক্ষীদের পরিচালিত যৌথ অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানগুলো সমুদ্রে আটকে পড়া অনেক জেলের জীবন বাঁচিয়েছে। স্থলসীমান্তে বিএসএফ এবং বিজিবি-র মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে এবং পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। নিরাপত্তা আমাদের সহযোগিতার শক্তিশালী ক্ষেত্রগুলোর অন্যতম এবং আমাদের সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনির মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে।'

বক্তব্যের শেষভাগে হাই কমিশনার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নয়নসমূহের ওপর আলোকপাত করে বলেন, 'একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের বৈদেশিক নীতি অন্যান্য দেশের মত আমাদের নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সফর বিনিময় আমাদের সম্পর্কে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছে। ২০১৫ সালের জুনে প্রধানমন্ত্রী মোদির বাংলাদেশে ঐতিহাসিক সফরের সময় ঐতিহাসিক স্থল সীমানা চুক্তিসহ ২২টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৭ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সফরে ২০১৫ সালে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি দেখার সুযোগ হয়েছে। এই সফর উভয় দেশের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন নিশ্চিত করে এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের বাইরে এক সর্বব্যাপ্ত অংশীদারিত্ব দিয়ে আমাদের সম্পর্কে এক সোনালি অধ্যায়ে সূচনা করেছে। সংযোগ, উন্নয়ন ও অবকাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্র, তথ্যপ্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, মহাকাশ, বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি প্রভৃতির মত ক্ষেত্রে আমাদের অংশীদারিত্ব জোরদার করে তাঁর সফরকালে রেকর্ডসংখ্যক ৩৬টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক রয়েছে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, লজিস্টিকস, শিক্ষা ও মেডিক্যাল সেক্টরের মত ক্ষেত্র যেখানে ভারতীয় সরকারি-বেসরকারি কোম্পানিসমূহ এক হাজার কোটি ডলারের অধিক বিনিয়োগ করছে।

হাই কমিশনার উল্লেখ করেন যে, ভারত ও বাংলাদেশ সভ্যতার যোগসূত্র বহন করে এবং সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি বলেন, 'আমাদের অনন্য ও বিশেষ সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে জনগণের মধ্যে যোগাযোগ। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অভিন্ন মূল্যবোধের জন্য আমরা ১৯৭১ সালে আপনাদের মুক্তিযুদ্ধে একযোগে লড়াই করেছি। মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনকারী ভারতীয় সৈন্যদের নিকটাত্মীয়দের সম্মান জানানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্যসাধারণ সৌজন্য ভারতের ১শো ২৫ কোটি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। আমাদের সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারা অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি এবং বিশেষ সৌজন্য হিসেবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অতিরিক্ত ১০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তি (বাংলাদেশী টাকায় ৪৬ কোটি) প্রদান; ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে বছরে ১০০ মুক্তিযোদ্ধাকে বিনামূল্যে চিকিৎসাদান এবং তাঁদের জন্য ৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদী মাল্টিপল ভিসা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন।'

'আমাদের দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বন্ধন সর্বস্তরে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক বিনিময়, মতবিনিময় ও প্রশিক্ষণ বিনিময়ের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের সার্বিক প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত তৎপরতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনির প্রধানদের পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ এবং তিন বাহিনির স্টাফদের বার্ষিক আলোচনা এ ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে। অনেকগুলি নতুন যৌথ মহড়া শুরু হয়েছে এবং বিদ্যমান মহড়াগুলির মানোন্নয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনির প্রশিক্ষণ পদ বৃদ্ধি এবং শুভেচ্ছা

৭১তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত

১৫ আগস্ট ২০১৭ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও নানা বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের নতুন চ্যান্সারি কমপ্লেক্সে ভারতের ৭১তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পতাকা উত্তোলনের পর ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বার্তা উপস্থিত ভারতীয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনান। অনুষ্ঠানে ছ'শোর অধিক ভারতীয় নাগরিক এবং হাই কমিশনের কর্মকতা উপস্থিত ছিলেন

সফরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এটিই কোন ভারতীয় সেনাপ্রধানের প্রথম সফর।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কাঠামো সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে অন্যান্য দলিলের বিনিময় দুই দেশের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এনডিসিবৃন্দ; এখানকার ডিফেন্স সার্ভিসেস্ স্টাফ কলেজ এবং ভারতের ডিফেন্স সার্ভিসেস্ কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ এবং ভারতের টাটা মেডিক্যাল সেন্টার ও বাংলাদেশের ডিরেক্টর জেনারেল মেডিক্যাল সার্ভিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক সহযোগিতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

হাই কমিশনার বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের এক নিবেদিতপ্রাণ উন্নয়ন অংশীদার। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নতদেশে পরিণত হওয়ার জন্য আপনাদের ভিশনের আমরা সর্বাত্মক সমর্থক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে ভারত ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের বিশেষ সুবিধানজনক আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার করেছে। এতে ৩০০ কোটি ডলারের প্রথম এবং দ্বিতীয় ঋণরেখা মিলিয়ে মোট ৮০০ কোটি ডলার দাঁড়াল।

'এই সফরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক এবং নতুন উচ্চ-প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সহযোগিতার সাম্প্রতিক তৎপরতা কৌশলগত ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি নিরাপত্তা, মহাকাশ, সাইবার নিরাপত্তা ও তথ্যপ্রযুক্তি সহযোগিতা এসবের অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রের শক্তিশালী উন্নয়ন মাত্রা রয়েছে, যেহেতু জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতার উপকার হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ, মে মাসে আমরা দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছি যা বাংলাদেশসহ অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের টেলিযোগাযোগ, টেলিমেডিসিন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর সহযোগিতার সেবাসহ বহুমাত্রিক সুবিধা প্রদান করবে।

'উভয় দেশের সহযোগিতায় সবচেয়ে গুরুত্বের জায়গা হল যোগাযোগ। যোগাযোগ আমাদের নিজস্ব প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে প্রথম নীতির অংশ। এটি একইসঙ্গে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও প্রবৃদ্ধি এবং আমাদের উভয় দেশের উন্নয়নের জন্য জরুরি। আমরা সকল রেলওয়ে সংযোগ পুনঃস্থাপন করার চেষ্টা করছি, যা ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা নতুন রেলওয়ে সংযোগ বৃদ্ধিরও চেষ্টা চালাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে রাধিকাপুর ও বিরোলের মধ্যে ৪র্থ রেলওয়ে সংযোগটি (পূর্বতম ৬টি রেলওয়ে সংযোগের অন্যতম) দুই প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। ২০১৮ সালের মধ্যে আরো ৩টি রেলওয়ে সংযোগের কাজ শেষ হবে। আমরা খুলনা ও কলকাতার মধ্যে নতুন যাত্রীবাহী 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' চালু করতে যাচ্ছি। এর পরীক্ষামূলক চলাচল ইতোমধ্যে হয়ে গেছে এবং বিদ্যমান মৈত্রী এক্সপ্রেসে দুই প্রান্তে বিধিবদ্ধ চেকিং সার্ভিস সম্পন্ন হলে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে ভ্রমণের সময় লক্ষণীয়ভাবে কমে যাবে। কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-শিলং-গৌহাটির অতিরিক্ত খুলনা ও কলকাতার মধ্যে একটি নতুন বাস সার্ভিস চালু হয়েছে।

'বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে সহযোগিতা গত কয়েক বছরে অনেক বেড়েছে। সরকারি-বেসরকারি উভয়খাতে নানামুখী সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে প্রায় ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে যাচ্ছি। বর্তমানে ভারত থেকে বাংলাদেশে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ইতোমধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে (পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে)। মঞ্জুরি সহায়তার অর্থায়নে আমরা এলএনজি সরবরাহ; ভারত ও বাংলাদেশের ঝিনাইদহ-খুলনার মধ্যে গ্যাস গ্রিড আন্তঃসংযোগ; কুতুবদিয়ায় আইওসিএল-এর একটি এলপিজি ইম্পোর্ট টার্মিনাল স্থাপন; এলপিজি পাইপলাইন নির্মাণ; এবং শিলিগুড়ি থেকে পার্বতীপুরে গ্যাসওয়েল সরবরাহে একটি মৈত্রী পাইপলাইন নির্মাণ করতে যাচ্ছি।

'বেসামরিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ সহযোগিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান ক্ষেত্র। যেহেতু বাংলাদেশ তার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বহুমুখী করতে চাচ্ছে এবং রূপপুরে তার প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মাণ করতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে বেসামরিক পারমাণবিক জ্বালানি ক্ষেত্রে ৩টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আমরা জলবিদ্যুৎ এবং

১ জুলাই ২০১৭ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মুনমুন আহমেদের সাক্ষাৎ

৮-৯ জুলাই ২০১৭ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁয়ে কৃষি, উদ্যান ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর বাংলাদেশে শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন এবং ভারত-বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির সহায়তায় ভারতীয় বণিক সমিতি আয়োজিত ভারত-বাংলাদেশ ক্রেতা-বিক্রেতা সাক্ষাতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বক্তব্য প্রদান। প্রধান অতিথি মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমুর উদ্বোধন করা এ অনুষ্ঠানে ভারতের ৫০টি ব্যবসায়ী কোম্পানি এবং বাংলাদেশের ২৫০টি ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করে

১২ জুলাই ২০১৭ ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনে ইন্দোনেশিয়ার নবাগতা রাষ্ট্রদূত মিসেস রিনা পি সোয়েমারোকে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

১০ জুলাই ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা খুলনার চুকনগর বধ্যভূমি পরিদর্শন, শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২০ মে এখানে হাজার হাজার শিশু নারী ও মুক্তিযোদ্ধা নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন

১৬ জুলাই ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা *প্রথম আলো* অফিস পরিদর্শন এবং জ্যেষ্ঠ সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন

ভুটানের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার জন্য যৌথ বিনিয়োগের উদ্যোগ নিচ্ছি।

'আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে চলেছি। এর সাম্প্রতিক কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে আমাদের স্মার্ট সিটিজ উদ্যোগের আলোকে রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটে নগর উন্নয়ন প্রকল্পে ভারতের সহায়তা।

'আমরা বিদ্যুৎ দক্ষতা বিষয়েও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে ১০০০০ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এলইডি বাল্ব স্থাপনের একটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আমরা নতুন একটি ঋণরেখার আওতায় বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প যৌথভাবে হাতে নিতে যাচ্ছি, এটি আমাদের নিজস্ব নমামি গঙ্গা প্রকল্পের অনুরূপ। আমরা শুধু অবকাঠামো উন্নয়নে আমাদের অংশীদারিত্ব চাই না, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও চাই এবং বাংলাদেশে ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন।'

শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, 'আমাদের সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম এবং আমরা সঠিক পথেই চলছি। আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মডেল। আমরা শুধু আমাদের সব অমীমাংসিত সমস্যা বাস্তবোচিতভাবে সমাধান করিনি, বরং আমাদের উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছি এবং আমাদের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে নিবেদিত রয়েছি। আমাদের জনগণে-জনগণে বন্ধন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। ভিসা উদারিকরণে আমাদের উদ্যোগে লক্ষণীয় ফল পাওয়া গেছে। বিদেশি পর্যটক আগমনের সাপেক্ষে আজ বাংলাদেশের পর্যটকরা ভারতের এক নম্বর পর্যটনকারী। এ বছর জুন মাস নাগাদ (ছয় মাসে) মানুষ বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ১৩ লাখের বেশিবার যাতায়াত করেছে। আমাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিসীম এবং এটা ধরে রাখতে আমরা পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

● নিজস্ব প্রতিবেদন

'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' শিক্ষামেলায় হাই কমিশনার

এ ধরনের শিক্ষামেলা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সাধ্যের মধ্যে বিশ্বমানের শিক্ষা পেতে অনেক অপশন থেকে একটি বেছে নেওয়ার চমৎকার সুযোগ

২১ জুলাই ২০১৭ ভারতের এএফএআইআরএস এক্সিবিশন এন্ড মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বিআইসিসি-তে তাদের বাংলাদেশী পার্টনার 'এ টু জেড স্টাডি'-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' নামে একটি শিক্ষা মেলার আয়োজন করে। ২১-২২ জুলাই দু'দিনের এ মেলায় ভারতের আবাসিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটসহ ৩০টিরও বেশি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা মেলার উদ্বোধন করেন এবং সুশিক্ষা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি মেলায় আগত বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলেন।

৪র্থ ইন্ডিয়া এডুকেশন ফেয়ার

২৮ জুলাই ২০১৭ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ঢাকার ফার্মগেটে *ডেইলি স্টার কনভেনশন হলে* এসএপিই ইভেন্টস এন্ড মিডিয়া লিমিটেড ও ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত ৪র্থ ইন্ডিয়া এডুকেশন ফেয়ারের উদ্বোধন করেন। ২৮-২৯ জুলাই দু'দিনের এ মেলায় ভারতের ৪০টিরও বেশি সেরা স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি নতুন প্রজন্মের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মত উন্নত ক্যাম্পাস ও প্রচলিত ডিগ্রির পাশাপাশি চাকরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্সের সুযোগ করায় ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তনের প্রশংসা করেন। এ ধরনের শিক্ষামেলা বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের ভারতে সাধ্যের মধ্যে বিশ্বমানের শিক্ষা পেতে অনেক অপশন থেকে একটি বেছে নেওয়ার চমৎকার সুযোগ করে দেয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, তরুণদের মাঝে এমন যোগাযোগ ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্কে সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করছে। তিনি আয়োজক, এসএপিই ইভেন্টস এন্ড মিডিয়া লিমিটেড এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধন্যবাদ জানান এবং এ মেলা থেকে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

স্বাধীনতা দিবসের
বিশেষ নিবন্ধ

টুইটার কূটনীতি

সামাজিক মাধ্যমে ভারতের সাফল্যগাথা

বিনীতা পান্ডে

বিশ্ব যোগাযোগের দ্রুত ও জ্বলন্ত বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে। সামাজিক মাধ্যম এদের অন্যতম। ভারত সরকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে নতুন প্রাযুক্তিক বিপ্লব দ্রুত শুধু গ্রহণই করেনি, শীর্ষস্থানেও পৌঁছে গেছে। এর ৫টি টুইটার বিশ্বের সবচেয়ে ব্যবহৃত ১০টির টুইটারের অন্তর্গত। এগুলি হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (@ Narendramodi), তাঁর অফিস (@ PMOIndia), পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ (@ sushmaswaraj), পররাষ্ট্র মন্ত্রক (@ MEAIndia) ও ভারতের রাষ্ট্রপতি (@ Rashtrapatibvn)। প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম টুইটার ব্যবহারকারী এবং ইনস্টাগ্রামের সর্বোচ্চ ব্যবহারকারী। সুষমা স্বরাজ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অনুসৃত পররাষ্ট্রমন্ত্রী। MEA হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অনুসৃত সরকারি অফিসসমূহের অন্যতম।

বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে নাগরিকদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ, ভিসা, বিদেশী নাগরিকদের সাহায্য করা অথবা বিদেশী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় হিসেবে ভারত সরকার হ্যাশট্যাগ কূটনীতি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সরকার ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান কমাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও কূটনীতিকেরা ১৪০টি বর্ণে (টুইটারের) কথা বলার সৌকর্যে নিখুঁত হয়ে উঠেছেন। ভারত সেই স্বল্প কয়েকটি দেশের একটি যার সবগুলি বৈদেশিক মিশন ও কূটনীতিকরা বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের সমর্থনদান ছাড়াও তাঁদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার বিস্তারিত তথ্য ও কূটনৈতিক সংবাদ প্রদানে টুইটারে অতি সক্রিয়।

২০১৪ সালের মে মাসে এনডিএ সরকারের অধীনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকার ও কূটনীতিকদের সামাজিক মাধ্যমকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারে ভারতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে শুধু সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় নন, তাঁর গোটা সরকারের ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামের মত মঞ্চসমূহে রয়েছে বিরাট উপস্থিতি। প্রধানমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যম শব্দটি ব্যবহার করেন ‘সরাসরি ডায়ালিং’ হিসেবে যেখানে সরকার তার নাগরিকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারে।

তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইটারে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ অনুসৃত নেতা, তাঁর অনুসরণকারীর সংখ্যা ৩ কোটি ২১ লাখ। তাঁর আগে আছেন যথাক্রমে পোপ ফ্রান্সিস ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। টুইপ্লোম্যাসির ক্রম অনুসারে, মোদি এশিয়ার সর্বোচ্চ অনুসৃত নেতা। ইনস্টাগ্রামেও তিনি সর্বাধিক অনুসৃত ও কার্যকর বিশ্ব নেতা, তাঁর অনুসরণকারীর সংখ্যা ৬৮ লাখ। ট্রাম্পের অনুসরণকারীর সংখ্যা ৬৩ লাখ। মোদির প্রত্যেকটি পোস্ট গড়ে ২ লাখ ২৩ হাজার অনুসরণকারী গ্রহণ করেন ও প্রতিক্রিয়া জানান। এটি সব ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর মধ্যে সর্বোচ্চ। নরেন্দ্র মোদির ফেসবুক পেজের অনুসরণকারীর সংখ্যা ৪ কোটি ২১ লাখ ১৯ হাজার ৪৫১ জন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিদেশ সফরের ঘোষণা দিতে ও তিনি যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তা নিয়ে আলোচনা করতে কার্যকরভাবে এ মঞ্চ ব্যবহার করেন। তিনি সানন্দে তাদের উদ্বেগের বিষয়ে জনগণের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।

২০১৫ সালে ফেসবুকের সিইও (মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা) মার্ক জুকারবার্গের সঙ্গে আলোচনাকালে মোদি তাঁর সরকারে সামাজিক মাধ্যমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তিনি একে কোন জিনিস সম্পর্কে জানার, কিভাবে দায় নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে দিক-নির্দেশনা দিতে হবে, তার পথ প্রদর্শক (গাইড) হিসেবে নিয়েছেন। মোদি আরও বলেন যে, এটি জনগণের সঙ্গে সরকারকে সরাসরি সংযুক্ত করতে এবং সঠিক সময়ে প্রতিক্রিয়া পেতে সাহায্য করে।

ভারতীয় কূটনীতি যা ঐতিহ্যগতভাবে রক্ষণশীল ও সুরক্ষিত জীবনে অভ্যস্ত, নিজেকে সর্বোচ্চ সক্রিয় ও প্রতিসক্রিয় হতে বদলে নিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ থেকে শুরু করে সকল ভারতীয় মিশন ও দূতাবাস সামাজিক মাধ্যমে অতি সক্রিয়ভাবে উপস্থিত।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বাধিক অনুসৃত পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁর অনুসরণকারীর সংখ্যা ৮৭ লাখ ৫০ হাজার। অন্যদিকে, বিদেশ মন্ত্রকের টুইটার ব্যবহার সামাজিক মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ জনপ্রিয় মন্ত্রক। এর অনুসরণকারীর সংখ্যা ১৪ লাখ ২০ হাজার। বিদেশ মন্ত্রকের সরকারি ডিপ্লোম্যাসির আরেকটি টুইটার একাউন্ট @IndianDiplomacy-র অনুসরণকারীর সংখ্যা খুব স্বল্প সময়ে ১৩ লাখ ছুঁয়েছে। @MEAIndia এবং @IndianDiplomacy-র একত্রিত অনুসরণ সংখ্যা ২৭ লাখ যা ভারতীয় ডিজিটাল ডিপ্লোম্যাসিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে, MEA অর্থাৎ বিদেশ মন্ত্রকের পাসপোর্ট ডিভিশনের টুইটার হ্যান্ডেল @passportsevamea ও @CPVIndia (উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য নিয়োজিত পাসপোর্ট ডিভিশন) আরেকটি জনপ্রিয় একাউন্ট যা ভ্রমণের কাগজপত্র সংক্রান্ত বিষয়াদি ও বিলম্বজনিত ভোগান্তি নিরসন করে। এছাড়াও দুই প্রতিমন্ত্রী ডি কে সিং এবং এম জে আকবর টুইটার ব্যবহারে খুবই সক্রিয় ও জনপ্রিয়। এঁদের যথাক্রমে ১০ লাখ ও ৯০ হাজার অনুসরণকারী রয়েছে। অন্যান্য সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটেও MEA-র কর্মকাণ্ড একইরকমভাবে উৎসাহব্যঞ্জক। ফেসবুকে সুষমা স্বরাজের অনুসরণকারীর সংখ্যা ২৮ লাখ ৫৩ হাজার ৮৫২ এবং বিদেশ মন্ত্রকের অনুসরণকারীর সংখ্যা ২০ লাখ ৩০ হাজার ৪৮০।

বিশেষ করে বিদেশ মন্ত্রক একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যেখানে সকল দুর্ঘটনা ও বিভিন্ন বিষয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাছাই করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শুরু করে। সব বার্তাই জরুরিভিত্তিতে গ্রহণ, আমলে নেওয়া ও কালক্ষেপণ না করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এটা জনগণের মধ্যে আস্থা অর্জনের একটা বড় কাজ করেছে তা শুধু নয়, কার্যকর পরিচালন, জনগণের ক্ষমতায়ন, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং দ্রুত দুর্ভোগ হ্রাসেরও পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়াও একটা বার্তা বিদেশে আটকে পড়া বা সরকারের সাহায্যপ্রার্থী ভারতীয়ের কাছে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া যে, এখন আর শুধু ঈশ্বরের দয়ার উপর তাকে নির্ভর করতে হবে না।

উদ্রো উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক ঊর্ধ্বতন সহযোগী মাইকেল কুগেলম্যান *কোয়ার্টজ ইন্ডিয়া* ম্যাগাজিনকে বলেন, "জনগণ এটা ভেবে ক্ষমতায়িত বোধ করেন যে, বিদেশে যদি আপনি জটিল পরিস্থিতিতে পড়েন, আপনি আপনার বিদেশমন্ত্রীকে, দূতাবাসকে সাহায্য চেয়ে টুইট পাঠাতে পারেন– এই সত্যিকার প্রত্যাশা নিয়ে যে, তাঁরা আপনার আবেদনে সাড়া দেবেন ও সাহায্য করবেন।"

সুষমা স্বরাজের টুইটার কার্যক্রম চলে সপ্তাহের ৭দিন ২৪ ঘণ্টাব্যাপী এবং অনেক ধরনের কার্যক্রম যেখানে চলছে। সাহায্যপ্রার্থী ভারতীয় ও বিদেশীদের সাহায্য করার জন্য তিনি কার্যকরভাবে টুইটার ব্যবহার করে চলেছেন। তিনি শুধু ভারতীয়দের কাছ থেকে ভিসা, পাসপোর্ট উদ্ধারের আহ্বান পান না, অনেক সময় বিদেশীদের কাছ থেকেও পান। বিদেশমন্ত্রীর কালক্ষেপণ না করে সাড়াদানের রেকর্ড রয়েছে। অনেক সময় খুবই অসুবিধাজনক সময় যেমন রাত ২টা কিংবা রাত ৪টায় টুইট করা হয়। এটা হতে পারে মহাত্মা গান্ধীর ছবিসংবলিত পাপোশ আমাজন থেকে সরিয়ে নেওয়া কিংবা মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপনেচ্ছু এক দম্পতির শেষ মুহূর্তে পাসপোর্ট প্রদানের অনুরোধ– ভারতের একজন কর্মতৎপর প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন। সম্ভবত সে কারণেই কেউ তাদের পারিবারিক সমস্যা সমাধানে টুইটার ব্যবহারে পিছপা হন না। এক ব্যক্তি তার ফ্রিজের যান্ত্রিক ত্রুটি নিরসনে সাহায্য চেয়ে সুষমা স্বরাজকে টুইট করেছেন। সুষমা জবাব দিয়েছেন, "ভাই আপনার রেফ্রিজারেটরের ব্যাপারে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না। আমি মানবীয় বিপর্যয় মোকবিলায় খুব ব্যস্ত।" আরেকজন মজা করে লিখেছেন, "আমি মঙ্গলগ্রহে আটকা পড়েছি, মঙ্গলায়নের (৯৭৮) মাধ্যমে পাঠানো খাদ্য কয়েকদিন আগে শেষ হয়ে গেছে। মঙ্গলায়ন-২ কখন পাঠানো হবে? দ্রুত তার জবাব আসে, "আপনি যদি মঙ্গলগ্রহেও আটকে পড়েন, সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস আপনাকে সাহায্য করবে।" এই বিবৃতি এখন ভারতীয় কূটনীতির 'ক্যাচ ওয়ার্ড'-এ পরিণত হয়েছে।

সুষমা বিদেশে রাজনৈতিক বার্তা প্রদানেও এই মঞ্চ ব্যবহার করছেন কখনও বন্ধুত্বের হাত প্রসারে, কখনও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সরতাজ আজিজকে ভর্ৎসনায়।

ভারতীয় সাফল্যগাথা শুধু এর অনুসরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমেই দৃশ্যমান হচ্ছে এমন নয়, বরং কার্যকর ও দ্রুততার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন বিষয়ের মোকাবিলায়। সামাজিক মাধ্যম সরকারের কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়, তা সে হোক ইয়েমেনে বিরাটসংখ্যক মানুষকে কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরাতে আটকে পড়া ভারতীয় নাবিককে উদ্ধার করা, সমুদ্র দস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা বা অপহৃত ভারতীয়দের ফেরত আনা, নেপালে ভূমিকম্পে সাড়াদান, বিপর্যয়ে ভারতীয়দের সাহায্য প্রদান।

প্যারিসে ইউনেস্কোয় দেওয়া এর বক্তৃতায় ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব নিরুপমা রাও বলেন, "সামাজিক মাধ্যমের যুগে ডিপ্লোম্যাসি কূটনীতি ওজোন চেম্বার থেকে, এর সংরক্ষিত অতীত থেকে বেরিয়ে আন্তঃসক্রিয়, অধিকতর সংযুক্ত, অধিকতর মানবকেন্দ্রিক, মানবপ্রেমী... বিশ্বব্যাপী ভারতীয় দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনগুলি এখন ফেসবুক, ইউটিউব ও টুইটারে সক্রিয় এবং কিছুদিন আগেও যা ভারতীয় কর্মকর্তাতন্ত্রের অনধিগম্য ছিল, তা এখন অতি গম্য হয়ে উঠতে শুরু করেছে।"

সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় ভারত সরকার এখন জনগণকে বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে ওয়াকেবহাল রাখছেন। মালদ্বীপে নৌবাহিনির জাহাজ প্রেরণ থেকে শুরু করে নেপালের ভূমিকম্পের সময় দ্রুত সাড়াদান, আফগানিস্তানকে তার উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণে সহায়তাদান, কূটনৈতিক ফোরামে ভারতের উদ্বেগ প্রকাশ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সামাজিক মাধ্যম হচ্ছে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের চিরায়ত বৃত্ত ভেঙে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার নতুন পথ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অধিকতর অনানুষ্ঠানিক কাঠামোয় তাঁর অন্যান্য বিদেশী প্রতিপক্ষের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হতে এ মঞ্চ ব্যবহার করেন। মোদি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে ওয়েইবো ব্যবহার করেছেন। তিনি শিনঝো আবের সঙ্গে জাপানি ভাষায় টুইট করেছেন। হিব্রুতে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুকে এবং হিন্দিতে জবাব পেয়েছেন। এছাড়াও দিল্লি মেট্রোয় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুলের সঙ্গে, চিনের প্রধানমন্ত্রী লি কিকিয়াং এবং ফিজির প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঙ্ক বাইনিমারামার সঙ্গে তাঁর তোলা সেলফি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যা সাধারণ মানুষের বুঝতে সহজতর কূটনীতিতে জটিল শরীরীভাষা তৈরি করেছে। সামাজিক মাধ্যমকে ধন্যবাদ, টুইটার ডিপ্লোম্যাসি বা হ্যাশট্যাগ ডিপ্লোম্যাসি ভারতীয় ডিপ্লোম্যাসির জন্য নতুন মাধ্যম: দ্রুত জ্বলন্ত এবং কার্যকর। ● অনুবাদ মানসী চৌধুরী

বিনীতা পান্ডে, ঊর্ধ্বতন সম্পাদক, দ্য পাইওনিয়ার

স্বাধীনতা দিবসের
বিশেষ নিবন্ধ

ই-গভর্ন্যান্স

নাগরিকবান্ধব গভর্ন্যান্সের ভারতীয় উদাহরণ

আর এস শর্মা

ভাল গভর্ন্যান্সের জন্য সরকার ও নাগরিকের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি একটি মৌলিক বিষয়। মানবকল্যাণে জাতিসংঘ প্রণীত নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। এটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, আইসিটি ভাল গভর্ন্যান্সের প্রসার ঘটায়। আইসিটি উন্মুক্ত ও দায়বদ্ধ গভর্ন্যান্স প্রসারে নীতি-প্রক্রিয়ায় নাগরিকের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বাস তৈরিতে সাহায্য করে। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ নাগরিকদের কাছে সহজ, দক্ষ ও স্বচ্ছভাবে সুলভ হতে পারে। আইসিটি গণপ্রক্রিয়াকরণ কাজ এবং সরকারি প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

ভারত ২০১৬ সালে জাতিসংঘ প্রকাশিত ই-গভর্ন্যান্স ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ১০৭তম অবস্থানে রয়েছে। সকল স্টেক হোল্ডারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় দেশের ক্রম ২০১৪-র তুলনায় ১১ ধাপ এগিয়েছে, যখন এ অবস্থান ছিল ১১৮। একইভাবে ই-পার্টিসিপেশন ইনডেক্সে উন্নতি প্রতিফলিত হয়েছে। ২০১৬ সালে ভারতের অবস্থানক্রম ছিল ২৭, ২০১৪-র ৪০-এর তুলনায়। তবে গত দশকেজুড়ে অব্যাহত অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে দেশে ডিজিটাল বিভক্তি বৈশিষ্ট্যমূলকভাবে অব্যাহত রয়েছে। টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (টিআরএআই) প্রকাশিত টেলিকম উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১৭ সালের মে-র শেষ নাগাদ শহুরে টেলি-ঘনত্ব বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭২ দশমিক ২৮ এবং গ্রামীণ টেলি-ঘনত্ব দাঁড়িয়েছে ৫৫ দশমিক ৮৯।

ই-গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে সরকারের নাগরিকবান্ধব উদ্যোগ

ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি

২০১৫ সালে সরকার ঘোষিত দৃষ্টি-আকর্ষণমূলক কর্মসূচি 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের অংশগ্রহণে ভারতকে ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা, দেশের ব্যবসায় ও অঙ্গীকারকে ডিজিটাল উপায়ে ক্ষমতায়িত সমাজে রূপান্তরিত করা এবং উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক পুঁজির জ্ঞান অর্থনীতিতে পরিবাহিত করা। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ৯টি স্তম্ভের মধ্যে সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে:

১. ব্রডব্যান্ড মহাসড়ক সৃষ্টি;
২. ই-গভর্ন্যান্স– প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের পুনর্গঠন;
৩. ইক্রান্তি– সেবাসমূহের বৈদ্যুতিন সরবরাহ।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাহায্য করা:

১. প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ব্যবহার্য হিসেবে ডিজিটাল অবকাঠামো
২. চাহিদা অনুযায়ী গভর্ন্যান্স ও সেবাসমূহ
৩. নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন

সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নাগরিকবান্ধব ই-গভর্ন্যান্স গড়ে তুলতে অনেকগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের কয়েকটিকে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে অভিনব হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় যেহেতু আমাদের দেশে সংস্কৃতি, ভাষা ও বৈশিষ্ট্যে বিপুল বৈচিত্র্য রয়েছে।

ভারতের ডিজিটাল পরিচয় অবকাঠামো

সরকার 'ইন্ডিয়ার ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি' নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে উচ্চভিলাষী ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পসমূহের অন্যতম ইউনিক আইডেনটিফিকেশন (ইউআইডি) প্রকল্প প্রবর্তন করেছে। ইউআইডি-র লক্ষ্য হচ্ছে 'আধার' নামে পরিচিত বায়োমেট্রিক্স ও জনমিতি তথ্যের মাধ্যমে যে কোন ভারতীয় নাগরিকের যথাসময়ে পরিচয় পরীক্ষা করা। সরকার সেবাসমূহের সরবরাহ এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক স্কিম প্রবর্তন করেছে যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের নীচুতলার নাগরিকদের উত্তরণ ও উপকার। অধিকন্তু সরকার এলপিজি ভর্তুকি, ছাত্রবৃত্তি, অবসরভাতা এবং সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা প্রভৃতির মত অনেক কল্যাণমূলক স্কিমের সঙ্গে আধারকে সংযুক্ত করে দিয়েছে যাতে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে উপকার পৌঁছে দেওয়া যায়।

ভারতের পেমেন্ট অবকাঠামো

অভিন্ন পেমেন্টস ইন্টারফেস

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন সুবিধা পৌঁছে দিতে অভিন্ন মঞ্চ ও ব্যবহারবিধি প্রবর্তন করা হয়েছে। ইউনিফাইড পেমেন্টস্ ইন্টারফেস (ইউপিআই) হচ্ছে এরকম একটি ব্যবস্থা যা অনেকগুলি ব্যাংক একাউন্ট (যে কোন অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের), বিভিন্ন ব্যাংকিং তথ্য, সিমলেস ফান্ড রাউটিং এবং মার্চেন্ট পেমেন্টসমূহকে একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশনে একীভূত করতে পেরেছে।

ভারত ইন্টারফেস ফর মানি (বিএইচআইএম) এ্যাপ প্রবর্তন গণমানুষকে ডিজিটাল উপায়ে আর্থিক লেনদেন সহজতর, সরলতর ও দ্রুততর করতে সক্ষম করেছে। মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত করে দেওয়ায় এর ব্যবহারকে অনন্য করে তুলেছে।

অন্যান্য ই-গভর্ন্যান্স উদ্যোগ

সরকার প্রবর্তিত ইউনিফাইড মোবাইল এ্যাপলিকেশন ফর নিউ এজ গভর্ন্যান্স (ইউএমএএনজি) এ্যাপলিকেশন নাগরিকদের একটি বিরাট অভিন্ন মঞ্চ দিয়েছে যাতে তাদের মোবাইল ফোনে কেন্দ্র, রাজ্য, এমনকি স্থানীয় সংস্থা ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার ২০০টির বেশি ই-গভর্ন্যান্স সেবায় প্রবেশাধিকার থাকবে। ইউএমএএনজি সেবাসমূহ মোবাইল এ্যাপ, ওয়েব, আইভিআর এবং এসএমএস-এর মত বহুবিধ চ্যানেলে নাগরিকদের কাছে সুলভ করা হয়েছে যাতে স্মার্ট ফোন, ফিচার ফোন, কম্পিউটার ও ট্যাবলেটের মাধ্যমে ঢোকা সম্ভব। ইউএমএএনজি আধারভিত্তিক প্রামাণিক ব্যবস্থাকেও নিশ্ছিদ্র করেছে।

সরকার প্রবর্তিত 'গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস'(জিইএম)-এর লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও গতিবেগ সঞ্চার করা। এটি সরকারি ব্যবহারকারীদের তাদের অর্থের সর্বোচ্চ মূল্য অর্জন ত্বরান্বিত করতে ই-বিডিং, রিভার্স ই-অকশন এবং ডিমান্ড এগ্রিগেশনের টুলগুলির যোগান দেয়।

'ই-প্রমাণ' ইন্টারনেট ও মোবাইল উপকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ই-গভর্ন্যান্স সেবায় 'ই-প্রমাণ' ব্যবহারকারীদের প্রবেশে তাদের পরিচয় পরীক্ষা করে বিভিন্ন স্তরে নিশ্চয়তা দিয়ে সত্যতা নিশ্চিত করে। 'ই-প্রমাণ' সত্যতা নিরূপণ পদ্ধতিতে অভিন্নতা দিচ্ছে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি সেবায় প্রবেশের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিচয় প্রমাণ বাতিল করেছে। এই এ্যাপলিকেশন দেশের লাখ লাখ পেনশনভোগীর উপকার করছে।

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন ও টিকিয়ে রাখায় টেলিকম খাতের ভূমিকা

ই-এ্যাকসেস সংযোগ ব্যবহার করে সকল নাগরিক সেবায় প্রবেশাধিকার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এক্ষেত্রে টেলিকম খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যা 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' রূপরেখা অনুধাবন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে। টেলিকম অবকাঠামো বিশেষ করে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকা অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডব্যান্ড মহসড়ক নির্মাণ, মোবাইল সংযোগে আন্তর্জাতিক প্রবেশাধিকার, সরকারি ইন্টারনেট প্রবেশাধিকার এবং দেশে স্মার্ট সিটি নির্মাণের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ভিত্তি তৈরি করেছে। ভারত সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে টেলিকম খাত শক্তিশালী করায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ক. ভারত সরকারের উদ্যোগসমূহ

ইউনিভার্সাল সার্ভিস অবলিগেশন (ইউএসও) ফান্ডের বিধান: ইউনিভার্সাল সার্ভিস অবলিগেশন ফান্ড (ইউএমওএফ) এনটিপি-১৯৯৯ থেকে গ্রামীণ এলাকাসহ সকল অন্তর্ভুক্তিহীন এলাকায় বৈশ্বিক সেবার বিধানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রদানের স্বপ্ন দেখেছে। ইউএসওএফ দেশের গ্রামীণ, অন্তর্ভুক্তিহীন ও অগম্য এলাকায় টেলিকম অবকাঠামো জোরদার ও বলবৎ করতে সক্ষম হয়েছে।

জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতি-২০০৪: সকল নাগরিকের জন্য সার্বজনীন ই-গভর্ন্যান্স প্রবেশাধিকার দিতে ভূগর্ভস্থ টেলিকম অবকাঠামো হিসেবে উচ্চগতির ব্যয়ক্ষম ব্রডব্যান্ড প্রাপ্রতা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই মাত্রায় ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নে জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতি-২০০৪ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটিয়ে টেলিকম অবকাঠামোর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে।

ন্যাশনাল টেলিকম নীতি-২০১২: ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো বিস্তার দেশের নাগরিকদের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির চাবিকাঠি। দেশের গড় দেশজ উৎপাদন ও ব্রডব্যান্ড অন্তর্ভুক্তির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এই বাস্তবতা স্বীকার করে সরকারের রূপরেখা দলিল ন্যাশনাল টেলিকম নীতি-২০১২ (এনটিপি-২০১২) টোলযোগাযোগকে একটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে দেশকে একটি ক্ষমতায়িত, অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তরের কাজে নিয়োজিত। এনটিপি-২০১২-র অন্যতম লক্ষ্য নাগরিকদের অংশগ্রহণে সক্ষম করেছে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন চাকরি, গভর্ন্যান্স, ব্যাংকিং প্রভৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে অবদান রাখতে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ই-গভর্ন্যান্সে অবদান রেখেছে।

ডিজিটাল ইণ্ডিয়া এবং ভারতনেট বাস্তবায়ন: ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো শক্তিশালী করার উদ্যোগ হিসেবে ভারত সরকার ২০১১ সালে দেশের আড়াই লাখ গ্রাম

পঞ্চায়েতে সংযোগ প্রদানের জন্য জাতীয় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক (এনওএফএন) প্রতিষ্ঠা করে যা পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত ব্যান্ডউইডথসহ ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিত করবে। ই-শিক্ষা, প্রত্যন্ত স্বাস্থ্য নজরদারি, ই-গভর্ন্যান্স, আবহাওয়া, কৃষি প্রভৃতি বিষয় আওতায় এনে জিটুসি, বিটুবি, পিটুপি, বিটুসি ইত্যাদি সেবাসমূহ এনওএফএর-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নাগালে আসবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অধিকতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে এনওএফএন কার্যত ভারতনেট প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মানোন্নয়ন করেছে।

খ. সরকারের ই-গভর্ন্যান্সের সঙ্গে সহযোগিতাকল্পে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-র উদ্যোগসমূহ

১. **দ্রুত ব্রডব্যান্ড সরবরাহ:** টিআরএআই ২০১৫ সালের এপ্রিলে ব্রডব্যান্ড উৎপাদনের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে অলরাইট অফ ওয়ে (আরওডব্লিউ– পথের সর্বস্বত্ব) প্রস্তাবমালার জন্য এক-জানালা ও সময়-নির্দিষ্ট ছাড়ের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে। টিআরএআই ব্রডব্যান্ড সংযোগের আওতায় ইউএসওএফ-র ভুর্তকির মাধ্যমে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-শিক্ষা, এম-স্বাস্থ্য, এম-ব্যাংকিং ও অন্যান্য সেবাসহ ই-গভর্ন্যান্সের সেবাসমূহ সরবরাহের জন্য সরকারকে মডেল ব্যবহারকারী ও উপস্থাপক ভাড়াটের ভূমিকা পালনেরও সুপারিশ করেছে।

২. **ভারতনেট বাস্তবায়ন:** টিআরএআই ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারের কাছে ন্যাশনাল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক, ভারতনেটের জন্য পছন্দসই বাছাই হিসেবে বিল্ড-ওন-অপারেট ট্রান্সফার/বিল্ড-অপারেট-ট্রান্সফার মডেলসমূহের শিরায় দীর্ঘমেয়াদী সেবা সরবরাহসহ বেসরকারি ইনসেনটিভ দিতে পারে এমন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সুপারিশ করে ভারতনেট বাস্তবায়নের কৌশলসংবলিত সুপারিশমালা পাঠিয়েছে।

৩. **ইউএসএসডিভিত্তিক মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেন:** গ্রামের বিপুলসংখ্যক মানুষ রয়েছেন যাদের আছে শুধু ফিচার ফোন। ইউএসএসডিভিত্তিক প্রোগ্রাম মৌলিক ফিচার ফোন ব্যাংকিং লেনদেন করার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারিত করতে টিআরএআই ২০১৬ সালের নভেম্বরে লেনদেন পিছু ট্যারিফ ধার্য করেছে সর্বোচ্চ ৫০ পয়সা। ৫টি ধাপে সম্পন্ন এ লেনদেন আগে ৮টি ধাপে সম্পন্ন হত, হার ছিল সেশন পিছু ১.৫০ রূপি।

৪. **আধারভিত্তিক ই-কেওয়াইসি নিয়মাবলী:** টিআরএআই নতুন মোবাইল সংযোগ পেতে অন্যতম বৈধ দলিল হিসেবে আধারের বৈদ্যুতিন কেওয়াইসি অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এর পরপরই সরকার ২০১৬ সালের আগস্টে ই-কেওয়াইসি নীতিমালা প্রকাশ করে যাতে উপভোক্তার আবেদন ও যথাযর্থতা দ্রুততর ও সহজতরভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

৫. **সরকারি ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড সংযোগ:** দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বাড়াতে টিআরএআই ২০১৭ সালের মার্চে 'সরকারি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড উৎপাদন' শীর্ষক সর্বশেষ প্রকাশনায় বিধিনিষেধ ও বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে যা দেশে ওয়াই-ফাইয়ের অবাধ ও ব্যাপক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

৬. **ক্রয়ক্ষমতার ব্যবধান কমানো:** গ্রামীণ এলাকায় ক্রয়ক্ষমতার ব্যবধান কমাতে টিআরএআই ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে 'বিনামূল্যে উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় উপাত্ত ব্যবহারে উৎসাহিত করা'-র সুপারিশ পাঠিয়েছে। টিআরএআই গ্রামীণ এলাকা যুক্তিসঙ্গত উপাত্ত, ধরুন প্রতিমাসে ১০০ মেগাবাইট, উপভোক্তাদের বিনামূল্যে যোগান দেওয়ার সুপারিশ করেছে। স্কিম বাস্তবায়নের ব্যয় ইউএসওএফ থেকে মেটানো যেতে পারে।

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন উদ্যোগ নাগরিকদের জন্য ই-গভর্ন্যান্স সেবাদানে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করবে। এসব উদ্যোগ ভারতকে একটি ডিজিটাল উপায়ে ক্ষমতায়িত সমাজে পরিণত করবে এবং পদ্ধতিসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনবে।

অনুবাদ মানসী চৌধুরী

আর এস শর্মা
টিআরএআই-এর চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন স্কিমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুলসংখ্যক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. আইসিসিআর স্কলারশিপসমূহ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কোর্স গ্রহণে নিম্নোক্ত স্কলারশিপসমূহ প্রদান করে:

ক. ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম;
খ. বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম;
গ. সার্ক স্কলারশিপ স্কিম;
ঘ. কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম; এবং
ঙ. আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম।

ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম

যুব বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী বিনিময় বৃদ্ধির ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরকালে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে আইসিসিআর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্কিমটি প্রবর্তন করে। এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচ ডি কোর্স (ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিসিন ছাড়া)-এ ভারতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর প্রতি বছর প্রকৌশল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি, চারুকলা ও চিরায়ত ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

সার্ক স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/ স্নাতকোত্তর/ এম ফিল/ পিএইচডি (মেডিসিন ছাড়া) কোর্সে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত ক-ঘ স্কিমগুলির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দানের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আরো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.hcidhaka.gov.in

আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর-এর এ কোর্সের জন্য স্কলারশিপ নির্বাচন সমন্বয় করে থাকে। স্কিমটি সাধারণত জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৭-১৮

আবেদনকারীদের বিপুল সাড়া এবং আগ্রহের প্রেক্ষিতে ভারতীয় হাই কমিশন আইসিসিআর শিক্ষা বৃত্তি ২০১৭-২০১৮-এর আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিস্তারিত তথ্য/দিক নির্দেশনাসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার এই লিঙ্ক http://www.hcidhaka.gov.in/pages.php?id=19741-এ দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থীকে এই লিঙ্ক থেকে আবেদন পত্র ডাউনলোড এবং পূরণ (টাইপ করা হতে হবে, হাতে লেখা গ্রহণযোগ্য নয়) করতে বলা হয়েছিল। আবেদনপত্রে ছবি স্ক্যান করে সংযুক্ত করে এবং স্বাক্ষর (হাতে লিখে স্ক্যানকৃত স্বাক্ষর) ও তথ্যাদিসহ আবেদনপত্রটি পিডিএফ ফরম্যাটে তৈরি করে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ নিচে উল্লেখিত যে কোন ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপের জন্য এবং পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষার করার জন্য ই- মেইল করতে বলা হয়:

ক. ভারতীয় হাই কমিশন,ঢাকা: attedu@hcidhaka.gov.in
খ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, চট্টগ্রাম: ahc@colbd.net
গ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, রাজশাহী: ahc.rajshahi@mea.gov.in

যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষা (ইপিটি) অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি ২০১৭। এবছর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে রেকর্ডসংখ্যক ১৭২১ জন শিক্ষার্থী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স-এর আইসিসিআর স্কলারশিপ ২০১৭-র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের শেষ সময়, যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা ইত্যাদি ফেসবুকের এই পেজসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

• বিজ্ঞপ্তি

প্রবন্ধ

কালিদাসের মেঘদূত

প্র স ঙ্গ ক থা

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

আজকের পাঠকের কাছে সাধারণভাবে সংস্কৃত সাহিত্য এবং বিশেষভাবে কালিদাস কতখানি আবেদন-সঞ্চারী তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়, গত বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে বাঙালি পাঠক সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ব্যাপক অংশে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছে। সংস্কৃত নাকি মৃত ভাষা, পুরোহিতগিরিতে কাজে লাগে কেবল, এরকম অপযুক্তির লেবেল এঁটে জীয়ন্তে সমাধিস্থ করার কাজ চলছে ভাষাটির। ফলে আধুনিক পাঠক উমবার্তো একো পড়েন কিন্তু বানভট্ট পড়েন না, জাঁ আনুই তার নাটকপাঠের অন্তর্গত হয় কিন্তু ভাস, শূদ্রক অথবা ভবভূতি হন না, শেলি-কিটস-ওয়ার্ডসওয়ার্থ আদৃত হলেও কালিদাস থেকে যান অচ্ছুত।

বিবেচনাটিকে কি যথার্থ বলে মানতে হবে? আজকের পাঠকের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য, *রামায়ণ-মহাভারত*– এ দুটি মহাকাব্যসমেত, সমূলে পরিত্যাজ্য? কবি হিসেবে কালিদাস কতখানি অভিনিবেশ পেতে পারেন, তা না জেনেই আমাদের সামূহিক কাব্যপাঠ সন্তোষজনক হয়ে উঠতে পারে? সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ-ভামহ-রাজকেশর-দণ্ডী-বামন-ভরত প্রমুখের মতামতগুলি নিতান্তই তুচ্ছ, ভ্রান্ত, ব্রাত্য?

অথচ বাঙালি মনীষার বিগত দুশো বছরের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে এমন কোন স্বনামধন্যের সাক্ষাৎ পাব না, যিনি উত্তম সংস্কৃত জানতেন না, সংস্কৃতের অসীম ভাণ্ডারের কাছে কোন না কোনভাবে ঋণী নন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ... তাঁরা কি যথেষ্ট আধুনিক ছিলেন না? কেবল তো সংস্কৃতই নয়, তার পূর্ববর্তী বৈদিক ভাষা, পরবর্তী পালি ভাষা নিয়েও গভীর চর্চা করে গেছেন বাঙালি, ফলে বেদ-উপনিষদ আর ধম্মপদ, জাতক অনূদিত হতে পেরেছে, যা বাঙালির মননচর্চায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আজও সক্রিয়। রমেশচন্দ্র দত্তের বেদের অনুবাদ, কালীপ্রসন্নের মহাভারত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের নীলকণ্ঠ টীকা-সমেত মহাভারতের অনুবাদকর্ম, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের *রামায়ণ*-অনুবাদ, ঈশানচন্দ্র ঘোষের *জাতক* অনুবাদ, রাজশেখর বসুর *রামায়ণ-মহাভারতের* সংক্ষেপিত গদ্যানুবাদ, এগুলো সব, সমস্তটাই পুরোহিতবৃত্তি? রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরীর *কাদম্বরী* ব্যাখ্যা, *শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত* নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ, তারাশঙ্করের তর্করত্ন এবং পরে অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কাদম্বরীর* বঙ্গানুবাদ, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, সুখময় ভট্টাচার্য, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, সুকুমারী ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু থেকে হালে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর *রামায়ণ-মহাভারত* ব্যাখ্যা কি নিতান্তই মগজের অথবা বিলাসিতা?

আরো আছে। সত্যজিৎ-ঋত্বিক নিঃসন্দেহে আধুনিক। এঁদের সংস্কৃত অনুশীলন এবং নিজেদের চলচ্চিত্রকর্মে তার প্রয়োগ, কী ভেবে ঘটালেন এঁরা? বা মকবুল ফিদা হুসেন তাঁর চলচ্চিত্রের চরিত্র *গজগামিনী*তে এত বিপুলভাবে কালিদাস থেকে ধার নিতে গেলেন কেন? ঋত্বিকের *কোমল গান্ধার* ছবিতে দেখি, *শকুন্তলার* নাট্যাভিনয়ের মহড়া চলছে। অনসূয়া নামে যে চলচ্চিত্রের চরিত্র, সে শকুন্তলার ভূমিকায় অভিনয় করবে। কিন্তু সে মহড়ায় মনোযোগী হতে পারছে না, শকুন্তলা চরিত্র তাকে টানছেই না। অমনি ঋত্বিক অন্য এক চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন, উদ্বাস্তু অনসূয়ার সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সমমাত্রিকতা, দুজনেই নিরুপায় ও বাধ্য, হরিণশিশুর মায়া ত্যাগ করে, বৃক্ষ-লতা-বনানীর চির-অভ্যস্ততার বাইরে চলে যেতে হচ্ছে, হয়েছে দুজনকেই। বিস্ময়কর প্যারাডাইম! কালিদাসকে মোক্ষম কাজে লাগালেন এইভাবে ঋত্বিক। কেবল তাই নয়, *কোমল গান্ধার*-এ শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার অংশটুকু রাখলেন ঋত্বিক, যা বহুতল মাত্রা নিয়ে এসেছে ছবিটিতে। *সুবর্ণরেখায়* তেমনি কালি, 'The terrible mother'-এর প্রয়োগ, যার সম্পর্কে ঋত্বিক লিখছেন তাঁর 'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে' নিবন্ধে, 'আজ সব সভ্যতার জীবন মনন সমস্যা ঐ Confrontation-এর ওপরে... ভালো করে অনুধাবন করতে বলি ছবিতে ব্যবহৃত বেদ ও উপনিষদের শ্লোকগুলি। অনেক ভেবে, অনেক বাছাই করে ঐ কটিকে আমি গ্রহণ করেছিলাম। তাদের প্রত্যেকটির বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে এবং আমার অর্থপ্রকাশের পক্ষে তারা খুবই সাহায্য করেছে।'

সত্যজিতেও রয়েছে সংস্কৃতের ঋণ, যা তিনি তাঁর 'ডিটেলস সম্পর্কে দু চার কথা' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখছেন, 'আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে উপমার প্রাচুর্যের কথা সকলেই জানেন। এই উপমা জিনিসটা নেতাৎই সাহিত্যের বস্তু।' তারপর প্রসঙ্গত তিনি কালিদাসের উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলেছেন, যেখানে ইন্দুমতির স্বয়ংবরসভা তাঁর কাছে মনে হয়েছে চিত্রধর্মী। এরপর তিনি চলে যান *রামায়ণ-মহাভারতে*, '*রামায়ণ-মহাভারত* ইত্যাদি মহাকাব্যের বিপুল আয়তনের একটা প্রধান কারণ হল ডিটেলের প্রাচুর্য। বিশেষত *মহাভারতকে* চলচ্চিত্রসুলভ ডিটেলের স্বর্ণখনি বলা চলে।' এরপর সত্যজিৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে গান্ধারী তাঁর দিব্যচক্ষু দিয়ে রণভূমির অবস্থা দেখে কৃষ্ণকে যা বলেছিলেন, তা উদ্ধার করে পাঠককে দেখিয়েছেন। সত্যজিতের যাবতীয় শিল্পকর্ম, আমরা জানি ডিটেলের স্বর্ণখনি; আর যে-সব ছবির নির্মাণ ভাবনায়, অন্যান্য বহু আকরিকের মত সংস্কৃত সাহিত্য পাঠও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল, এ-কথা মানতে বোধহয় আর আপত্তি থাকার কথা নয়। সত্যজিতের ইচ্ছে ছিল, মহাভারতের পাশাখেলার নাটকীয়তা নিয়ে ছবি তৈরি করবেন। ব্যাসে-সত্যজিতে সেই দুর্লভ সংযোগটি আর ঘটে উঠল না শেষ পর্যন্ত, তবে সত্যজিতের এ-জাতীয় ভাবনাটিই কি সংস্কৃতের প্রতি, এই ভাষায় লেখা মহাকাব্যটির প্রতি তাঁর সম্ভ্রমবোধের নিদর্শন নয়?

অতএব দেখতে পাচ্ছি, সংস্কৃতের প্রতি আমাদের আজানুলম্বিত ঋণ। পরশুরাম তাঁর 'ভূশণ্ডীর মাঠে' গল্পে মেঘদূতের অনুষঙ্গ নিয়ে আসেন, শকুন্তলাকে বাঙালি পাঠকের উপযোগী করে তোলেন, বিদ্যাসাগর আর অবনীন্দ্রনাথ, শরদিন্দু থেকে সুকুমার সেন সংস্কৃত থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে তাঁদের লেখায় বুনে দেন, কালিদাসের বৌদ্ধবিদ্বেষ বনাম শেকস্‌পীয়রের ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে তুমুল-তর্ক হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলায়* 'দুরাদয়শ্চক্র' ছাড়াও একাধিক অধ্যায়ারম্ভে কালিদাস-সুভাষিতের ব্যবহার, রঙ্গলাল থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সেলিম আলদীন পর্যন্ত কালিদাসের বিনির্মাণ, এই বিচ্ছিন্ন উদাহরণগুলো আমাদের এই সাহসী সিদ্ধান্তে উপনীত করায়, সংস্কৃত সাহিত্যপাঠ ছাড়া একজন আধুনিক সাহিত্যপাঠকের সাহিত্যপাঠ অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য।

দুই.

ওপরের বিশদ গৌরচন্দ্রিকাটি করে নেওয়া গেল এ-কারণেই, যাতে কালিদাসের *মেঘদূত* আলোচনা আজকের দিনে সামঞ্জস্যহীন ও অযথা না ঠেকে। একশো কুড়ি-বাইশ শ্লোকে মন্দাক্রান্তা ছন্দে *মেঘদূত* কালিদাসের অন্যান্য যাবতীয় রচনার তুলনায় অধিক জনপ্রিয়। এ-কাব্যের টীকা রচনা করেছেন মল্লিনাথ থেকে শুরু করে আরো অন্তত পঞ্চাশজন। কেবল বাংলাভাষাতেই *মেঘদূত* অনূদিত হয়েছে শতাধিকবার। অনুবাদকের মধ্যে প্রধানরা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কাব্যটির তিব্বতি ও চিনা অনুবাদের সংবাদও জানা যায়। 'দূতকাব্য' অভিধায় ভূষিত এই কাব্যের জনপ্রিয়তা ছিল এমন তুঙ্গে, যে এর অনুকরণে 'দূতকাব্য'-এর জন্ম হল, আর লেখা হতে লাগল *হংসদূত, ইন্দ্রদূত, কাকদূত* নামে একের পর এক দূতকাব্য। কোন দূতকাব্যই কালিদাসের কবিকৃতির ত্রিসীমানায় আসতে পারেনি, একমাত্র ধোয়ী-রচিত *পবনদূত* কালিদাসের সুদূরপ্রসারী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আজও কিঞ্চিৎ পঠিত হয়ে থাকে।

অথচ কাব্যটির উৎসে কিন্তু কালিদাসের স্বকীয়তা রয়েছে একথা বলা যাবে না। রামায়ণে হনুমানকে রামের দূত করে অশোকবনে সীতার কাছে পাঠানো হয়েছিল। মহাভারতেও দেখি, নল হংসকে দূত পাঠাচ্ছেন দময়ন্তীর কাছে। শ্রীহর্ষ-রচিত *নৈষধীয়চরিতম্*-এও রয়েছে হংসদূতের বিদগ্ধ ক্রিয়াকলাপ। এমনকি কালিদাসের *রঘুবংশম্*-এর ১৩শ সর্গে যে রাম-সীতার বিমান ভ্রমণ, লংকা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ভারতবর্ষের ভূগোল সুস্পষ্ট যাথার্থ্যতায় উঠে এসেছে,–এও তো একধরনের দূতকাব্যেরই প্রকারভেদ। তবু মেঘদূত রামায়ণ-মহাভারতের কাছে অধমর্ণতা নিয়েও অনন্যতায় সংস্কৃত সাহিত্যে সম্পূর্ণ একক, তুলনারহিত আর অপূর্ব এক খণ্ডকাব্য।

হ্যাঁ, সংজ্ঞা অনুযায়ী কাব্যটিকে 'খণ্ডকাব্য' নামেই আখ্যায়িত করেন আলংকারিকেরা। মহাকাব্যের প্রতিতুলনায় খণ্ডকাব্য, কেন-না তা মহাকাব্যের জটিল শাখা-প্রশাখায় বেড়ে ওঠে না, অতিঅল্প বিস্তার। সংস্কৃতে অমরুশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক নামে শতককাব্যগুলো এই ধারার অন্তর্গত। এ-জাতীয় কাব্য স্বভাবতই লিরিকধর্মী, যেখানে ব্যক্তিহৃদয়ের প্রতিফলন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দেয়। আবার, মেঘকে দূত করে পাঠানো হয়েছে বলে এর অন্য নাম সন্দেশ-কাব্য।

মেঘদূত কাব্যের মূল সুর বিরহের। বাঙালি পাঠকের অভ্যস্ত পাঠ-পরিমণ্ডলে প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদ বা মিলন– এসবের সঙ্গে তাঁর প্রভূত পরিচয় আছে। একদিকে বৈষ্ণব-কবিতা এবং তার পাশাপাশি মৈমনসিংহগীতিকায় আদিরসের বহুবিচিত্র মানচিত্রের সঙ্গে পাঠকমাত্রেই পরিচিত। শিক্ষিত বাঙালিমাত্রের কাছে শেকস্‌পীয়র, ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা, এমনকি আধুনিক ইংরেজ কবিদের, ভিক্টোরিও, জর্জীয়, প্রি-রাফালোইট থেকে সাম্প্রতিকতম কবিরা বহুল আদৃত। এ-বাবদে মিসিং লিংক হিসেবে রয়ে গেছেন সংস্কৃত আর ফার্সি কবিরা, যেমন জয়দেব তেমন রুদকি, যেমন কালিদাস তেমনি রুমি, যেমন বাণভট্ট তেমনি হাফেজ।

বলা হল, *মেঘদূত* বিরহের কাব্য। স্বভাবত প্রেমের কাব্যও, কেন না, প্রেমের প্রাক-শর্ত না থাকলে বিরহের তাৎপর্য থাকে না। এ-কাব্যের কাহিনি-অংশ খুবই ছোট। কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ কাজে অবহেলা করেছিল বলে তার একবছরের সাজা হল, স্বর্গ ছেড়ে স্ত্রীবিরহিত হয়ে তাকে থাকতে

হবে পৃথিবীর রামগিরি পাহাড়ে। শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্বাসনকালের আট মাস কেটে গেল, বাকি আর চার মাস। এ-সময়ে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘের আবির্ভাব দেখে যক্ষের বিরহবোধ তীব্র হয়ে উঠল। স্ত্রীর চিন্তায় ব্যাকুল যক্ষ মেঘকে অলকায় গিয়ে তার কুশলসংবাদ জানাতে বলল। মেঘ রামগিরি থেকে যে যে পথ ধরে অলকায় যাবে, যক্ষ তার পথনির্দেশও দিয়ে দিল। প্রাচীন ভারতের নদনদী পাহাড়পর্বত নগর-জনপদ পশুপাখি মানুষজন ফুলফলের চিত্রমালা এর মাধ্যমে কালিদাস আমাদের উন্মোচন করে দেখান, দেখান লোকাচার, লোকসংস্কার, নগর ও গ্রামের বৈচিত্র্য ও অনন্যতা।

কাব্যটির দুটি অংশ, পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। পূর্বমেঘ অংশকে আলংকারিকরা বলেন 'প্রয়াণ', উত্তরমেঘকে বলেন 'প্রাপ্তি'। উত্তরমেঘে তাহলে প্রাপ্তি কী? প্রাপ্তি অলকা, তার সৌন্দর্য, এবং সেখানে অবস্থিত বিরহতাপিত যক্ষপত্নী, সন্তানহীনা যে নারী দ্বারপ্রান্তের তরুণ মন্দারকে পুত্রস্নেহে সমাদর করে।

বিরহই মেঘদূতের মূল সুর। সন্ত কবীর যে বলেছিলেন, 'বিরহ হ্যায় এক সুলতান', সেই সুলতানের বিধুর ও অব্যয় সুলতানিয়াতে বাস করি আমরা। যক্ষের প্রতিটি বাক্যের বেদনায় দীর্ণ না হয়ে পারি না। আট মাস প্রিয়াবিরহে কাতর যক্ষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাস লেখেন, যক্ষ 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ' : অর্থাৎ তার হাতের বলয় ঢিলে হয়ে গেছে, ব্যাস, এইটুকু। অথচ এইটুকুতেই ধরা দেয় প্রকৃত প্রেমিকের যাবতীয় বিধুরতা, তার অস্থিসার দেহ ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। কান্তা বিরহে আটমাস দীর্ঘ, সুদীর্ঘ সময়, যখন Dryden আমাদের স্মরণ করান, 'Love reckons hours for months and days for years, and every little absence is an age'.

আট মাস যক্ষের সহনীয় হল কোনক্রমে, কিন্তু পয়লা আষাঢ় যখন বর্ষা নামল, তখন স্মৃতিবিধুরতায় নিতান্ত কাতর সে। কিন্তু কেন? বর্ষাগমে কেন অবধারিতভাবে স্মৃতি এসে ভিড় করে? বৃষ্টি নিজেই তো সুদূরে পাড়ি দেবার পর অন্তিমে ঝরে পড়ে মাটিতে, এই অবনমন ও তার আগেকার নভোপরিক্রমার কি কোন সাজুয্য রয়েছে মানুষের মনের সঙ্গে? দেখা গেছে, আকাশে মেঘ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনের পুরনো দুয়ার একটু একটু করে খুলে যেতে থাকে। আবার সুখের স্মৃতি কিন্তু নয়, মন কেন যেন নির্বাচন করে দুঃখের স্মৃতি, কিংবা এমন সুখকর অতীত, যা আর ফিরে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন, 'বাদলা দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না, ফিরবে না, ফিরবে না সে'। বুকভরা বিফল হাহাকার মর্মবিদ্ধ করে তোলে, তবু বিরহীমন তা উপভোগ করে, করতে ভালবাসে। দুঃখের স্মরণে কী লাভ মানুষের? দুঃখ তাকে প্রকৃত কী দেয়?

দেয়। দুঃখের অভিঘাত এমনই স্থায়ী ও গাঢ় বোধ, যা তাকে খাঁটি সোনা করে, নিটোল করে, তাকে জাগিয়ে দেয়। অন্যদিকে সুখ মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, মানুষের পদবী থেকে তাকে বিচ্যুত করে ক্ষণিক, আত্মস্থ হতে দেয় না তাকে। সুখে তাই আমরা ভেসে যাই, দুঃখে হই আত্মস্থ। হ্যাঁ, দুঃখও আমাদের অভিভূত করে আমাদের নিজস্ব বলয় থেকে উন্মার্গে নিয়ে যেতে পারে। এবং তা যায়ও। কিন্তু যেহেতু মানুষ সর্বদা স্বভাবতই নিজের মঙ্গল চায়, দুঃখকে অতিক্রম করার প্রণোদনাটিও রয়ে গেছে তার মধ্যে। তার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে, 'সুখেদুঃখে সমে-কৃত্বা।' কিন্তু এইভাবে সমে আনবার পরে, সমীকৃত করবার পরে, স্মৃতিতে যখন দুঃখের পুনরাবর্তন ঘটে, তার সেই আবর্তন দুঃখের ওপারে নিয়ে ফেলে। বস্তুত তা মানুষকে আনন্দই দেয়। উপনিষদীয় অর্থে আনন্দ, যাকে অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যায় Cathersis বলতে পারি।

অতএব দুঃখও আমাদের আনন্দ ফিরে দিতে পারে। তা কী করে সম্ভব? সুখ আর দুঃখ মানুষের কাছে পরিযায়ীভাবে আসে। এর ঔপনিষদিক ব্যাখ্যা আছে, আছে বৌদ্ধশাস্ত্রেও ব্যাখ্যা। বুদ্ধদেব মানবজীবনে দুঃখের কারণ হিসেবে তন্হা বা তৃষ্ণাকে দায়ী করেছেন। রূপতৃষ্ণা, অর্থতৃষ্ণা, যশের তৃষ্ণা, আরো। আর সেটাই অন্য দর্শনমতে কাম। সাবধান করে দেওয়া হয়েছে 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন-শাম্যতি' বলে, কামের দ্বারা কাম শান্ত হয় না, আগুনে ঘি পড়লে যেমন আগুন নেভে না, তেমনি। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাততত্ত্ব হচ্ছে সেই অলাতচক্র, যার মোহে মানুষ শ্রেয় ভুলে প্রেয়কে জীবনে বৃত করে, দুঃখের সূতিকাগার যেটি। পৃথিবীতে এমন কোন দুঃখ নেই বা সুখ নেই, যাতে কাম, Satan, ইবলিস, মার বা তন্হার নেপথ্যের ভূমিকা অনুপস্থিত। সুখ আর আনন্দ, পুনরুক্তি করছি, কখনোই এক নয়।

আনন্দ তবে কী? মেঘদূতে যক্ষ যখন বিদিশা বা উজ্জয়িনীর কথা বলে, যখন মহাদেবের অলকার বাগানে শয়ানমূর্তির ছবি তুলে ধরে, যখন নগরবধূদের ভ্রূবিলাসের বর্ণনা দেয়, তার সংলাপে যখন দীর্ঘযামা ত্রিযামাদের আমরা চাক্ষুষ করি, বা যক্ষপ্রিয়ার কান্তিময় শরীরে আমরা আমাদের সমগ্র সৌন্দর্যবোধেরই যেন সারাৎসার পেয়ে যাই (পাঠককে তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী' শ্লোকটি বারবার পড়তে অনুরোধ করি, এর বঙ্গানুবাদ তো রয়েছেই, বুঝতে তাই অসুবিধে হবার কথা নয়), দুঃখসুখের ওপারে গিয়ে বর্ণনাকারী যক্ষ তখন প্রকৃত অর্থে আনন্দিত। আনন্দ তাই দুঃখ ও সুখের অতীত একটি অবস্থা। দুঃখের সঙ্গী বেদনা, আর সুখের সঙ্গী সম্ভোগ। আর দুঃখ বা সুখের অভিজ্ঞতা যদি শান্তি আনতে পারে তবে তা আনন্দ। শম্ থেকে শান্তি। প্রবল দুঃখ, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু, প্রাথমিকভাবে আনল বেদনার্ত অভিভব, পর্ণমোচী বৃক্ষের একাকী পত্রহীন হয়ে যাবার মতই যা বিধুরতাময়, সেটা দুঃখ। আর তার থেকে জাত হল যে উপলব্ধি, অর্থাৎ এই পৃথিবী নশ্বর, জীবজগৎ নশ্বর, সংসরতি ইতি সংসারঃ, সেটা আনন্দ। তাই দুঃখের প্রদীপ জ্বলে আনন্দের আবাহনের অন্তিমকে লক্ষ রেখেই। তবে আনন্দ পর্যন্ত পৌঁছনো চাই দুঃখের। এজন্য ন কর্ম লিপ্ততে নরে হতে হয়, যক্ষ যা হতে পেরেছিল। নইলে তো দুঃখেই অবগাহন জীবনভর। কর্মের বন্ধন, অসংখ্য বন্ধন, যা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে। দুঃখের স্ফুলিঙ্গ নইলে তো পৃথিবীর সর্বাঙ্গ সোনা হয়ে যাবার কথা।

মেঘদূত বিরহের কাব্য, বিচ্ছেদের নয়। বিরহ আসলে কী? যা আমার প্রত্যহের ও কাঙ্ক্ষিত, তার আপাত অনুপস্থিতিই বিরহ। তাই বিরহের শেষে কাম্যবস্তুটি পাবার সম্ভাবনাটি রয়ে যায়। কিন্তু যা জন্মের মত হারায়? তাকে বলব বিচ্ছেদ। বিরহে সন্তাপ, বিচ্ছেদে শোক। বিরহকে আমরা মিলন ও পুনর্মিলনের মধ্যবর্তী সময়, interregnum হিসেবে গণ্য করতে পারি। কালিদাসের যক্ষ তাই বিরহী। যখন তার নির্বাসনদণ্ড ঘটল রামগিরিতে, তার জীবনে প্রিয়াবিরহিত সন্তাপ যুক্ত হল। প্রিয়া ও স্ত্রী একই সঙ্গে, একই অঙ্গে। যক্ষকে নির্বাসন দেওয়া হল রামগিরিতে, যেজন্য বিরহের মাত্রা আরেকটু যুক্ত হল। এটি কিন্তু কবিরই প্রকল্প, পাঠককে অতিরিক্ত বেদনা দেবার জন্য। যক্ষ তাতে রিঅ্যাক্ট করেছে, কাব্যে তার প্রমাণ নেই। কেবল পাঠক হিসেবে আমাদের আক্ষেপ জন্মায়: আহা! শেষপর্যন্ত রামগিরি! সেখানকার স্মৃতিমুখরতা রামসীতার বনবাসপর্বকে ঘিরে, কঠোর নির্বাসনও এখানে সহনীয় হয়ে উঠেছিল যাদের কাছে, কেন-না সেখানে তাদের দাম্পত্য বিঘ্নিত হয়নি। এখানেই কালিদাসের শিল্পিতা।

যক্ষ নিজে কোন্ উত্তুঙ্গ দাম্পত্যে অন্বিত ছিল, তার প্রকাশ দেখিয়েছেন কবি যক্ষের উপলব্ধি আর অনুভুতিতে। মেঘের যাত্রাপথের যে নির্দেশ যক্ষ দিয়েছে, তাতেই তাকে প্রেমিক হিসেবে চিনিয়ে দেয়। প্রেম তাকে সুন্দর করে বাঁচতে শিখেয়েছে, তাই তার সংলাপ এত লাবণ্যমণ্ডিত, বর্ণময়, কাব্যসম্মত, সংযত এবং ওষধির মতই নিরাময়কারী। অক্ষয় প্রেমিকের দৃষ্টিতে সে জগৎসংসারকে অনুভব করে বলেই তার কাছে অলকা শুভ্রতার ঝলক নিয়ে আসে, 'বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যাঃ'। কাব্যের আদ্যন্ত এরকম সুন্দরের ধ্যান ছড়িয়ে আছে, বিরহী যক্ষের উচ্চারণে। এইখানেই তো বিরহ সুলতান। দয়িতাকে ভালবাসে বলেই তার প্রভুর কাজে বিঘ্ন ঘটে, বিরহ যক্ষের সৌন্দর্যবোধকে ম্লান করতে পারে না, কেন-না তার হৃদয়ে জ্বলছে সৌন্দর্যের দীপ। বৈষ্ণব কবির প্রেমবৈচিত্তের চেয়েও গাঢ়তর এই উপলব্ধি। একই সঙ্গে ক্ষমাশীল ও সৌন্দর্যময়। কাব্যের অন্তিমে যে প্রার্থনা, আশীর্বচন, শুভৈষা ছিল যক্ষের, মেঘের সঙ্গে যেন বিদ্যুতের কদাপি বিচ্ছেদ না ঘটে– অন্যতম অভিজ্ঞান বিরহীর সুলতানিয়াতের। নিজে এ-মুহূর্তে দুঃখার্ত, কিন্তু জগৎ যেন কখনো দাম্পত্যে আহত না হয়।

বাগর্থামিব সম্পৃক্তৌ যারা, তাদের অন্যতম শিব যা পারেনি, যক্ষ তা পারল। এবং তা বিরহী বলেই। সতীর মত মৃত্যু বিচ্ছেদ ঘটালে মহাদেবের প্রলয় নাচ নাচতেই হয়, কেন-না তা বিরহ নয়, বিচ্ছেদ। এইখানেই দুয়ের পার্থক্য।

বিচ্ছেদ কেবল তাণ্ডবনৃত্যই ঘটায় না, শ্রীরাধিকার মত ভাবসম্মিলনেরও জন্ম দেয়। রাধা জানতেন, কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরে আসতে পারবেন না। মাথুর কৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষায় থেকে থেকে রাধা নিজেকে প্রেমবৈচিত্তের উজানে স্থাপন করলেন; মনে করলেন, কৃষ্ণ প্রত্যাগত। শিবের শোকাভিভবকেও হার মানাল রাধার এই ভাবসম্মিলনের হ্যালুসিনেশন, তারই প্রগাঢ়তায় রাধার উক্তি, 'এতদিন পরে বঁধুয়া এলে, দেখা না হইত পরাণ গেলে!' শুনে আমাদেরই পরাণ যায় যায়! যত অন্তরঙ্গতা ও শারীরিকতায় রাধা কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, ততখানি হার্দ্য আর শরীরতন্ময়তা ছিলই তো না শিব-শিবানীর। অর্ধনারীশ্বর হয়েও। সতীর সঙ্গে শিবের শরীরমিলন কল্পনার বিষয় আমাদের। হরপার্বতী, দেবতাদের পরামর্শক্রমে বিয়ে হয় কুমার অর্থাৎ কার্তিকেয়র জন্মের জন্য। কুমার কিন্তু বিধিবদ্ধ উপায়ে জন্মায়নি, শিবের বীর্য আগুনে পড়ে সেই বীর্য থেকে; কার্তিকেয়র যে-জন্য পাবকি নাম। আর গণেশের জন্ম পার্বতীর গাত্রমল থেকে। শিব ও রাধা, দুজনেরই সতী/কৃষ্ণ বিচ্ছেদ যে দু'রকম অভিঘাত নিয়ে এল, তা কি উভয়ে যথাক্রমে পুরুষ এবং নারী বলে? নাকি শরীরমিলনের যে শান্তি, তারই উপঢৌকন রাধার রোমান্টিক ভাবসম্মিলন, হয়তো পরিণামে তা ভাব-শৃঙ্গারই হয়ে দাঁড়াবে। আর শিব তো জানলেনই না নারীশরীরের মাহাত্ম্য ও রঞ্জকতা, তাই সতীর মৃত্যুতে একমেব ক্রোধই তাঁর আশ্রয়। মৃতা স্ত্রী, তবু বেদনা জাগল না তাঁর। নারায়ণ যখন ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছেন সতীর দেহ। একান্ন অংশে। যার মধ্যে সতীর জঙ্ঘা, যোনি এমন কি রয়েছে হৃদয়ও। না, শিব বিমনা হন না সতীর দেহখণ্ড যখন এক এক স্থানে গিয়ে পড়ে, কেন-না শিবের তো সতীর দেহসম্ভোগের কোন স্মৃতি নেই। সতী শূন্যতায় মিলিয়ে গেলে তিনি শান্ত হন কেবল।

বিচ্ছেদ চিরশূন্যতা, অন্যদিকে বিরহের মধ্যে প্যান্ডোরার বাক্সের আশাদেবী হাতছানি দেন। তাই বিরহঋতুতে আমরা অতি উত্তুঙ্গতায় মনকে স্থাপন করতে পারি। এবং সে অনুভব দুঃখের হলেও স্মৃতির স্নিগ্ধ সজ্ঞারামে বাস করার নির্বৃতি।

মেঘদূত পাঠান্তে কিন্তু কালিদাসকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেও ইচ্ছে করে কিঞ্চিৎ। আচ্ছা, যক্ষের কী এমন অপরাধ ছিল যার জন্য তার একবছর ধরে কান্তাবিবরহের শাস্তি? সে ছিল নাকি কুবেরের উদ্যানপালক। কর্মে অবহেলা ঘটেছিল তার। উদ্যানপালক এমন কোনো কর্ম নয়, মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রূষাদানের মত দুরূহ, যাতে একটু অবহেলায় বাগানের ফলফুলের প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হবে। কাব্যে বিশদ বলা নেই, তবে অনুমান, যক্ষের ঐ পেশা। তো ফুলগাছের পরিচর্যা করতে করতে, পুষ্পবিতান দেখতে দেখতে তার বুঝি ঐ ফুলেরই অনুষঙ্গে স্ত্রীর কথা মনে আনতে নেই, আর অন্যমনস্কতার কারণ যে অবধারিতভাবে স্ত্রীকে নিয়ে ভাবতে বসা, তা-ই বা কুবের জানল কী করে? কৈলাসে বাস করলেও কুবের তো অন্তর্যামী নয়। তার সেখানে বসবাস স্রেফ অর্থের জোরে, অন্যথায় দেবতার চেয়ে তার পদবী নিচুতে। যক্ষ পরনারীর কথা চিন্তা করলেও না হয় কথা ছিল; মেনকা, ঘৃতাচী, রম্ভা অথবা উর্বশীর প্রতি যক্ষের কোন সংশ্লেষ দেখি না, তার কেবল স্ত্রীকে মনে পড়া। কালিদাস এটি জাস্টিফাই করতে পারলেন না। একমাত্র সামন্ত মানসিকতা ছাড়া এর ব্যাখ্যা মেলে না। কালিদাস অবশ্যই সামন্ততান্ত্রিক। তার প্রমাণ রঘুবংশের বিখ্যাত উক্তিটি, 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুম্ আদত্তেহি রসং রবিঃ',– হাজার গুণ ফিরিয়ে দিতেই সূর্য পৃথিবী থেকে রস, অর্থাৎ জল গ্রহণ করে। রাজার কর আদায়কে সমর্থন করতে তিনি একথা লিখেছেন। তুলনাটা ক্লাসিক নিঃসন্দেহে। কিন্তু সূর্য পৃথিবী থেকে রস গ্রহণ করে, তার পেছনে রসদাতার কোন শ্রম নেই, পুরোটাই প্রাকৃতিক পদ্ধতি! আর সেই রসে, জলে সূর্যের ব্যক্তিগত প্রয়োজনও নেই। কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে রস নিংড়ে নেওয়া রাজার রাজত্ব ও রাজাত্বকে যে সম্ভব করে তোলে, সে-সত্যটিকে উপমার মাধ্যমে কি লুকিয়ে ফেলা হল না? রাজার প্রাসাদ, রাজমুকুট দাসদাসী, অসংখ্য স্ত্রী, অনুচর তো সেই উদ্বৃত্তি মূল্যতত্ত্বের হাত ধরেই আসে, আর প্রজা তার রসদ জুগিয়ে ফতুর হয়। না, কালিদাস একজন পার্টিজান।

এর প্রমাণ তো *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকেও রয়েছে, কালিদাসের সামন্ততান্ত্রিকতা। রাজ-অন্তঃপুরের পরিচারিকা মালবিকার সঙ্গে বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের প্রণয়ে আমরা আপ্লুত বোধ করি। বিদূষকের সহায়তায় সে-প্রেম ক্রমশ কণ্টকবর্জিত হয়ে আসে, অবশেষে সফলও হয়। আর জানা যায়, মালবিকা আসলে রাজকন্যা, দস্যুহস্তে পড়ে ঘটনাচক্রে রাজ-অন্তঃপুরে স্থান পেয়েছে। এ-নাটকে মালবিকা চরিত্রে কৌলিন্যসঞ্চার করে এইভাবে তাকে অগ্নিমিত্রের যোগ্য করে তোলা হল। মালবিকা সত্যি সত্যি পরিচারিকা হলে এ-হেন বিষমবিবাহে অগ্নিমিত্রের চরিত্র কলুষিত হত। আর মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের পাশে অগ্নিমিত্রের স্ত্রীর হাহাকার আর বেদনাকে আমলই দেওয়া হল না। সমস্ত নাটকটিতে রানীর বিরুদ্ধে যে ছক পাতল বিদূষক আর রাজা, তা যেন প্রকৃত বাহবারই যোগ্য। এটি নিপাট সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব।

আমি ভুলে যাচ্ছি না কালিদাস একজন মহান কবি, যুগন্ধর এবং অপূর্বনির্মাণক্ষম। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়, কবিতায় স্বরাট। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তো কালিদাসের কাছে বহুভাবে ঋণী। কবিত্বের উত্তুঙ্গতা বাদ দিয়েও আমাদের মুগ্ধ, বিস্ময়াবিষ্ট করে তাঁর শব্দচয়ন, বাক্যগঠন প্রক্রিয়া, উপমার সরোবরে স্নিগ্ধ স্নান করিয়ে আনেন তিনি আমাদের, যাঁর প্রত্যেক বাক্যগঠনে রয়েছে সৌন্দর্যের অবস্থান, ছন্দের শাসন মান্য করে। সংস্কৃত ছন্দের অনুশাসন কী তীব্র, তার একটু ব্যাখ্যা করা যাক। এই যে মন্দাক্রান্তা ছন্দ, যে-ছন্দে আদ্যন্ত লেখা হয়েছে *মেঘদূত*, তার প্রত্যেকটি চরণের প্রথম চার অক্ষরকে ব্যত্যয়হীনভাবে হতে হবে দীর্ঘস্বর। সংস্কৃত ছন্দ কেবল মাত্রা-গুণে চলে না, বিভিন্ন ছন্দের নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়াও রয়েছে অক্ষরের বিন্যাস। হ্রস্বদীর্ঘ ঠিক কিভাবে হবে, তার নিপুণ নির্দেশ রয়ে গেছে। মন্দাক্রান্তায় অক্ষর থাকবে প্রতি চরণে সতেরটি, কিন্তু মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মৌভনৌগ্ন য যুগ্মম্' বিধান অনুযায়ী অক্ষরের ১, ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ১৩, ১৫-তম অক্ষরকে অবশ্যই হতে হবে দীর্ঘস্বর, বাকিগুলিকে হ্রস্ব। কত শব্দকে, বিভক্তিকে পরিহার করতে করতে এগোতে হয় মন্দাক্রান্তার (অন্যান্য সংস্কৃত ছন্দেরও) চরণনির্মাণে! এতে কৃত্রিমতা আসারও সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু কাব্যটি পাঠ করতে গিয়ে এর মাধুর্যে আমরা এমন মজে যাই, যে এর পেছনে কবির শ্রম আমাদের মনেই থাকে না।

প্রসঙ্গত, বাংলায় মন্দাক্রান্তা হয় না। অনেক কবি, প্রাবন্ধিক লাফালাফি করেন এ নিয়ে, তবু হয় না। বাংলায় যে হ্রস্ব-দীর্ঘর বালাই নেই। হ্যাঁ একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইচ্ছা সম্যক জগদদরশনে, কিন্তু পাথেয় নাস্তি', সার্থক উদাহরণ, যেখানে উচ্চারণকে হ্রস্বদীর্ঘ করে পড়তে হবে। কিন্তু এই কৃত্রিম উচ্চারণ করব কতক্ষণ?

কালিদাসের সৌন্দর্যচেতনার কথা বলছিলাম। এ নিয়ে আস্ত বই লেখা যায়। 'রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্',– এইভাবে বাক্যগঠন সম্ভব নয়, যদি নিজের ভেতরে শব্দের, কবিত্বের, সুন্দরের নিয়ত আরাধনা না থাকে। কালিদাসের মাহাত্ম্য অনেকে অনেকভাবে বর্ণনা করেছেন। কোলরিজ শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে যেমন বলেন 'myriad minded man', বানভট্ট কালিদাসে তেমনি পান মধুর ভারে আনত তৃপ্তি। কালিদাস-প্রশস্তির শিখরে দাঁড়িয়ে যে গাথাটি, আমি সেটি পুরোপুরি উদ্ধৃত না করে পারছি না:

পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে
কনীনিকাধিষ্ঠিত কালিদাসঃ।
অদ্যাপি তত্তুল্ল কবেরভাবাৎ
অনামিকা সার্থবতী বভুব॥

এর সঙ্গে তুলনীয় ম্যাথু আর্নল্ডের শেকস্‌পীয়র বন্দনাটি–

Others abide our question.
  Thau art free
We ask and ask : thau smilest
  and are still,
Out-topping knowledge!

আটমাসের বিরহে যক্ষের রিক্তভ্রংশপ্রকোষ্ঠ হওয়া, এ-জন্যই তো যক্ষকে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে শাস্তি মকুব করে দেওয়া উচিত ছিল কুবেরের। কিন্তু না, কুবের থেকে আংকল টম থেকে আ কিউ থেকে খোয়াবনামার তমিজ, সাবঅলটার্নের জীবনে স্ত্রী-সংসার, পরিপূর্ণ বৈধ প্রেমকে বাধা দিয়ে আসছে এক অলাতচক্র, প্রভুশক্তির আড়ালে। এর থেকে কোনদিন মুক্তি নেই অধস্তন ও প্রান্তিক মানুষের। আজকের পাঠক এইভাবেই নিতে পারেন মেঘদূতের পাঠ।

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়
ভারতের কবি, প্রাবন্ধিক

উৎসব

ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসব

সেলিনা হোসেন

২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে গুয়াহাটিতে যখন পৌঁছই তখন বিকেল শুরু হয়েছে মাত্র। চারদিকে ঝকঝকে রোদ। মাঘের শীতের দাপট নেই। এ সময়ে আসামবাসীর আছে মাঘ-বিহু। রাজ্যজুড়ে পালিত হয় বড়সড় আকারের পিঠাপুলির উৎসব। আগে যখন আসামে এসেছি তখন এ উৎসবের পিঠা খেয়েছি। উৎসবের আনন্দ আর বৈচিত্র্যে ভরে ছিল মন। এবারে বাংলাদেশ থেকে আমি আর শাহীন আখতার এসেছি আরেকটি উৎসবে যোগ দিতে। উৎসবের নাম ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসব। প্রথমবারের মত এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে ২৮, ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে।

বিমানবন্দরে আমাকে আনতে গিয়েছিল যে মেয়েটি তার নাম মেহজাবীন। শাহীনের জন্য এসেছে আরেকটি মেয়ে। আয়োজকরা ভলান্টিয়ার হিসেবে কলেজে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের যুক্ত করেছেন। দুজনের জন্য দুটো গাড়ি এসেছে বিমানবন্দরে। আমরা বিকেলের রোদ সঙ্গে নিয়ে হোটেল তাজ ভিভান্তে (Taj Vivanta) এসে পৌঁছুই। পরে দেখলাম প্রত্যেক লেখকের জন্যই এমন ব্যবস্থা। কারো কারো জন্য একজন সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। আমাকে যাকে দেওয়া হয়েছে সে ছেলেটির নাম প্রশান্ত ডেকা।

উৎসব প্রাঙ্গণের যেখানেই গিয়েছি সেখানেই সে স্বল্প দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকত। ৩১ জানুয়ারি ফেরার সময় আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে ওর ডিউটি শেষ হয়। আদিবাসী ছেলেটিকে ছোট উপহার দিলে ও হাসিমুখে তাকিয়ে বলে, আবার আসবেন। কোন সাহিত্য সম্মেলনে এমন প্রহরার ব্যবস্থা আমার নতুন অভিজ্ঞতা। আয়োজকদের কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কেন সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হল? তারা তেমন কোন উত্তর দেননি। প্রশ্নটি এড়িয়ে হেসে বলেছেন, বিদেশি অতিথিদের নিরাপত্তার ব্যাপারটি দেখতে হবে। আমি আর কথা বাড়াই না।

২০১৬ সালের ২৪ নভেম্বর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার পরিচালক ড. রীতা চৌধুরীর একটি ই-মেইল পাই। তাতে তিনি আসামে ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান।

২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথমবার আসাম গিয়েছিলাম নতুন সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত এক সাহিত্য সম্মেলনে। সেটি হয়েছিল গুয়াহাটির বাইরে বঙাইগাঁও জেলার মানিকপুর থানায়। দ্বিতীয়বার আসাম যাব, এই আনন্দে রীতা চৌধুরীকে আমন্ত্রণ গ্রহণের কথা জানাই। যে কোন সাহিত্য সম্মেলনে অনেক লেখকের সঙ্গে দেখা হয় এটাই আমার আনন্দের বড় জায়গা। ভিন্ন ভাষার একজন লেখক, নারী বা পুরুষ যেই হোন, আমার চিন্তার পরিসর বাড়ায়। নিজের সাহিত্যের অস্তিত্বের দিগন্তরেখা এসব সম্মেলন।

বিকেলে তাজ ডিভান্তে হোটেলের রেস্টুরেন্টে চা খেয়ে রিসেপশনে আসতে দেখলাম একজন মহিলা চেক ইন করছেন। তার রুম নাম্বার ৪২৩। তাকে বললাম, আমি আপনার প্রতিবেশী। রুম নং ৪২৫। তিনি হা-হা করে হেসে বললেন, আপনার নাম? বললাম, বাংলাদেশ থেকে এসেছি। সেলিনা হোসেন। তিনি আবারও উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, ওহ, আপনার সঙ্গে আমার একটি সেশন আছে। আমি গুগল থেকে আপনার সম্পর্কে জেনেছি। আমি রামী ছাবরা দিল্লি থেকে এসেছি। বললাম, পরিচয় হয়ে ভাল লাগল। চা খাবেন? আগে রুমে যাই। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম এবং একসঙ্গে চারতলায় উঠলাম। মনে হল আমার সামনে যেন উজ্জ্বল হাসির তারকা রামী। হাসির আড়ালে বয়স হারিয়ে যায়।

পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে ঢুকি। বিশাল প্রাঙ্গণ। সেদিনই দ্য আসাম ট্রিবিউন দৈনিকে এ অনুষ্ঠান বিষয়ে একটি সাপ্লিমেন্ট প্রকাশিত হয়েছে। মেলার উদ্বোধন করবেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভেদকর। সঙ্গে থাকবেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সনোওয়াল এবং শিক্ষামন্ত্রী ড. হিমান্ত বিশ্বাস শর্মা। এই তিনটি নামের পাশে যে নাম ক'টিতে আমার দৃষ্টি আটকে গেল তাঁরা তিনজনই লেখক। একজন জাপানি ভাষার খ্যাতিমান লেখক রান্দি টাগচি। দ্বিতীয়জন গোয়ার কঙ্কনি ভাষার লেখক দামোদর মাউজো। অন্যজন অরুণাচল প্রদেশের কবি মামাঙ দাই। দুজনে নিজেদের মাতৃ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন। মামাঙ দাই ইংরেজি ভাষায় লেখেন। তিনি পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ভাবলাম এদের সঙ্গে পরিচয় হওয়াই আমার সাহিত্য জানার পরিসর।

কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে আসার সময় রাস্তাজুড়ে দেখেছি বিপুল আয়োজনের শোভাযাত্রা। হেঁটে যাচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মীরা। কখনো দেখা যাচ্ছে স্কুলের শিক্ষার্থীদের। ছোট ছোট ট্রাকে আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন দৃশ্যের। বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন চিত্ররূপ ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিল্পীরা। অসুর হনন যেমন আছে, তেমন আছে ঢেঁকি, ধান, রান্নাবান্না ইত্যাদিসহ ঘরগেরস্থির ভঙ্গি। রাস্তার দু'পাশে, আইল্যান্ডে টানানো হয়েছে ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসবের ব্যানার। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা এসেছে ব্যানার হাতে করে। মনে হচ্ছিল উৎসবের আমেজে জমজমাট শহর। শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে নানা বিরূপ পরিস্থিতির কারণে। ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসবও তার ব্যতিক্রম নয়। নিজেকেই বলি, শান্তি আসুক আমাদের পৃথিবীতে। জয় হোক মানবিক বোধের।

প্রদীপ প্রজ্বলন ও সংগীত পরিবেশনের পরে শুরু হয় বক্তৃতা। উদ্বোধনী ভাষণের এই আনুষ্ঠানিকতা চিরাচরিত নিয়ম। বক্তৃতা করেন লেখকরা। সবশেষে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের পরিচালক ড. রীতা চৌধুরী। তবে যে বিষয়টি ভাল লেগেছে তা হল সরকারি বক্তারা বলেছেন, বস্তুগত উন্নয়নের সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ওপর আমরা জোর দিচ্ছি। এভাবে উন্নয়ন না হলে মানুষের মানবিক চেতনার বিকাশ হয় না। মানুষ ভুল পথে যায়। আমরা প্রথমবারের মত এই উৎসবের আয়োজন করেছি। এরপর থেকে প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসব পালিত হবে। আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্যও নানা আয়োজন থাকবে।

তুমুল করতালিতে মুখরিত হয় প্রাঙ্গণ। মঞ্চে টানানো ব্যানারের দিকে তাকালে দেখতে পাই ২২টি ভাষার লেখকেরা এসেছেন। ১৫০জনের বেশি লেখক এসেছেন। ৬০টি সেশনে ৬০টি বিষয়ের ওপর আলোচনা হবে। আরও আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও নাটক। অনুষ্ঠানের শেষ দিন ব্রহ্মপুত্র নদীতে নৌবিহার হবে আর কবিতা পড়বেন বিভিন্ন ভাষার কবিরা।

২৮ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রাঙ্গণজুড়ে ছয়টি হল বানানো হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হলের নাম বেজাবরুয়া হল। এরপর ছিল টেগোর হল, পণ্ডিত রমাবাঈ হল, প্রেমচাঁদ হল, সুব্রামনিয়া ভারতী হল, নলিনীবালা দেবী হল। লেখকদের নামে হলের নামকরণ হয়েছে। আমার প্রথম সেশন পড়ে পণ্ডিত রমাবাঈ হলে। বিষয় ছিল– 'এ রুম অফ হার ওন: ওমেন'স রাইটিংস'। আমার জন্য এটি একটি বহু চর্চিত বিষয়। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, লেখকের কোন লিঙ্গ নেই। এটি ছিল আমার আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য। নারী শুধু নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখবে না। তাকে মানুষ হিসেবে পৃথিবীকে দেখতে হবে। মানুষের যাবতীয় সংঘাত, বিপর্যয়, সংকট তার রচনায় উঠে আসবে। শুধু নারী হিসেবে তার দেখার পৃথিবী সংকুচিত থাকবে না। নারীর সৃজনের ক্ষমতা পূর্ণ জীবনকে দেখার ক্ষমতা। নারীর সৃষ্টিশীল রচনায় পুরোটাই উঠে আসতে হবে। তাকে শুধু নারী লেখক হিসেবে গৃহকোণে ঠেলে রাখা যাবে না। শ্রোতারা বিষয়টিকে ভালভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই আমাকে বলেছেন। এই সেশনে উপস্থিত ছিল চেন্নাই থেকে আসা তামিল ভাষার লেখক সালমা। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমি লেখক সালমাকে জানতাম। পরিচয় হয়ে ভাল লাগল। ওর উপন্যাস ওর জীবনের গল্প। সালমাকে আমার একটি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ বই উপহার দিই।

বিকেলে আড্ডা হয় রামীর সঙ্গে। ও মূলত সাংবাদিক। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে ওর বই প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বড় আকারের বই। নাম– *ব্রেকিং গ্রাউন্ড: জার্নি ইনটু দি মিডিয়া... এন্ড আউট*। রামী আমাকে একটি বই উপহার দেয়। বলে, কালতো তোমার আমার সেশন। আমি হেসে বলি, হ্যাঁ, তাইতো। দুজনে দুজনের লেখালেখির কথা বলব। ও হেসে বলে, আমার অভিজ্ঞতা সাংবাদিকতার। তোমার অভিজ্ঞতা সৃজনশীলতার। আমাদের অনুষ্ঠান জমবে মনে হয়। আমি ইভেন্টের কথা মনে করি। ওখানে লেখা আছে 'প্রবুদ্ধসুন্দর কর এন্ড উর্মি রহমান (মডারেটর) ইন কনভারসেশন উইথ সেলিনা হোসেন এন্ড রামী ছাবরা'। প্রবুদ্ধ ত্রিপুরা থেকে এসেছে। বাংলা ভাষার কবি। আমি আর কবি মুহাম্মদ সামাদ 'ত্রিপুরার বাংলা কবিতা' নামে একটি কবিতা সংকলন ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছিলাম। লক্ষ ছিল ত্রিপুরার কবিদের বাংলাদেশের পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করানো। এই সংকলনে প্রবুদ্ধসুন্দরের কবিতা ছাপা হয়েছে। ত্রিপুরার কবির সঙ্গে আমার পরিচয় হল গুয়াহাটির সাহিত্য-উৎসব প্রাঙ্গণে। কবির সঙ্গে পরিচয়ের আগে কবির কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। উর্মি রহমান বাংলাদেশের লেখক। উর্মিকে চিনি চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে। উর্মি বর্তমানে কলকাতায় থাকে। দু'জনে আমাদের সেশনের মডারেটর। এই সেশনটি হয় সুব্রামানিয়াম ভারতী হলে। এই হলের সম্মুখভাগটি বেশ উঁচু। আসন সংখ্যাও বেশি। হল পূর্ণ ছিল। তরুণ লেখকদের সংখ্যা ছিল বেশি। মডারেটরদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আমরা। এক পর্যায়ে দর্শকদের মাঝ থেকেও বেশি প্রশ্ন এসেছে। সব মিলিয়ে ভাল ছিল এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে দর্শক ছিলেন কলকাতার লেখক অমর মিত্র, ভগীরথ মিশ্র, বিনোদ ঘোষাল। ছিলেন আসামের লেখক ইমরান হোসেন, বাসুদেব রায়সহ অনেকে। পাঁচবছর আগে দিল্লির সার্ক রাইটার্স কনফারেন্সে দেখা হয়েছিল অসমীয় ভাষার খ্যাতিমান লেখক ইমরানের সঙ্গে। তার অনূদিত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে দিল্লির হারপার কলিন্স প্রকাশনা সংস্থা থেকে। অনূদিত গল্প পাঠ্য হয়েছে আমেরিকার দুটি কলেজে। এতকিছু গল্পের মাঝে ইমরানের উজ্জ্বল মুখ দেখি। ইমরান আমার লেখালেখির বিষয়ে আমাকে

প্রশ্ন করে। প্রশ্নটি ছিল মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাহিত্য নিয়ে। অনুষ্ঠান শেষে বেশ কয়েকজন তরুণ সামনে এসে দাঁড়ায়। অটোগ্রাফ চায়। তারা আসামে থাকে। তাদের ভাষা বাংলা।

রামী ছাবরা কবি তা জানতাম না। ওর বইয়ের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় দেখতে পাই একটি কবিতা। রামীর মাতৃভাষা পঞ্জাবি। ১৯৩৮ সালে রামীর জন্ম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খান এলাকায়। ভারতভাগের পরে তার পরিবার পাকিস্তান থেকে চলে আসে। সাংবাদিকতার বইয়ে যে কবিতা যুক্ত হয়েছে তার নাম *দ্য স্কাই'জ আওয়ার কমন বাউন্ডারি*, ইফ। কবিতাটি পঞ্জাবি ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। সঙ্গে অনুবাদ দেওয়া আছে। শুরুটা এমন:

These young boys
Neither ours, nor yours,
Were meant to adorn coffin-biers
The vigour of their youth
is the bloom on the progress we each seek to root
... ...

বেশ লম্বা একটি কবিতা। ১৯৯৯ সালের ২৬ জুন তিনি এই কবিতাটি সিটিজেন ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত ইমার্জেন্সি আরোপ করার ২৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে পড়েছিলেন। বইয়ের নামের সূত্র ধরে তিনি বইয়ের শেষ লাইনটি লিখেছেন এভাবে– But I have come to realize that the journey is not quite over and out, Yet. Cannot be, will not be, till it comes to its inevitable end.

অনুষ্ঠান শেষে হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে প্রেমচাঁদ হলে আসি। রামী তার বইটি উপহার দেয় উর্মি ও শাহীন আখতারকে। বইটির জন্য রামীকে অভিনন্দন জানালে সে আমাকে হেসে জড়িয়ে ধরে। সাহিত্য উৎসব এমনই সেতুবন্ধন।

টেগোর হলে দেখা হয় দামোদর মাউজোর সঙ্গে। অনুষ্ঠান শেষে বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বারো বছর আগে দিল্লিতে। সাহিত্য আকাদমি আয়োজিত দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য সম্মেলনে। ওই উৎসবে আমি একটি গল্প পড়েছিলাম।

আমি বললাম, যখন দৈনিকের সাপ্লিমেন্টে দেখলাম আপনি কঙ্কনি ভাষার লেখক তখন একবার মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে বোধহয় আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু নিজের স্মৃতিকে ঠিক নির্ভর করতে পারিনি।

দামোদর হাসলেন। তাঁর উপন্যাস দিলেন আমাকে। বললেন, উপন্যাসটি সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার পেয়েছে ১৯৮৩ সালে।

অভিনন্দন জানিয়ে বইটি হাতে নিয়ে দেখলাম বইয়ের নাম *কারমেলিন*। কঙ্কনি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছে বিদ্যা পাই। দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রামে লিপ্ত কারমেলিন। এই মেয়ের জীবনের গল্প এঁকেছেন দামোদর। উপন্যাসটিকে নিজের সমাজের খুব কাছের মনে করি। একই চিত্র, কিন্তু গোয়ার পটভূমি– ভিন্নতা সংস্কৃতির, সমাজ ব্যবস্থার, পরিবেশের। বাকিটুকু একই। কারমেলিন যেন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকা বাংলাদেশের মেয়ে। ওকেও কাজের সন্ধানে কুয়েত যেতে হয়। আরব প্রভুদের হাতে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়।

সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আগেই। ও বিয়েসূত্রে আসামবাসী, আদতে বাঙালি। বাংলা ও অসমীয়া দুই ভাষাতেই বই আছে ওর। এবার আমাকে দিয়েছে *নদীর নাম নিরুপমা* নামে একটি বই। বইটি বেরিয়েছে কলকাতা থেকে। লেখক নিরুপমা বরগোহাঞিয়ের জীবন, সাহিত্যবিষয়ক বই। সুপর্ণার লেখার ভঙ্গি ভাল লেগেছে। প্রথাগত জীবনী লেখা নয়, বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা।

এ পিকচার অফ ইন্ডিয়া: ফরেন পারস্পেকটিভ ছিল ৪৪ নম্বর সেশনের থিম। মডারেটর ছিলেন মকরন্দ পরানজাপে। মকরন্দ কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধের লেখক। ইংরেজিতে লেখেন। দিল্লির জেএনইউ-র ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। একই সেশনে আমি ছিলাম। আমাকে দেখেই বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কোরিয়ার জুনজুতে দেখা হয়েছিল ২০০৭ সালে। আমি খুশি হয়ে বললাম, হ্যাঁ, নভেম্বর মাসে এশিয়া-আফ্রিকা সাহিত্য সম্মেলনে। গুয়াহাটিতে এসে দীর্ঘ বছর আগে দেখা দু'জন লেখক আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমার স্মৃতিতে তারা দু'জন নেই হয়ে গেছেন, কিন্তু তাদের স্মৃতি সজীব আছে। এমন মিলনমেলা সাহিত্যবোধের মেলা। আমার ভাল লাগার সীমা থাকে না।

২৯ তারিখে এনবিটি আয়োজিত ডিনারে কথা হয় দু'জন লেখকের সঙ্গে। তাঁরা দু'জন আমি ঢোকার আগেই একটি টেবিলে বসেছিলেন। আমি গিয়ে সেই টেবিলে বসে নিজের পরিচয় দেই। বাংলাদেশের লেখক হিসেবে তারা আমাকে নামে চিনলেন। বললেন, আপনার একটি গল্প অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। একটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। নামটা বলতে পারছি না। তাঁরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ শর্মা কটন কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। এখন অবসরে আছেন। এলিজা শর্মাও চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। তিনি শিশু সাহিত্যের লেখক। বেশ কিছুক্ষণ গল্প হওয়ার পরে উপেন্দ্রনাথ বললেন, আমরা আপনার একটি উপন্যাস অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করতে চাই। আমি হা করে তাকিয়ে দেখে বলি, অনুবাদ! এলিজা আমার হাতে হাত রেখে বললেন, আমরা পারমিশন চাচ্ছি।

আমি সানন্দেই পারমিশন দিলাম। দু'জনে একসঙ্গে বললেন, থ্যাঙ্কু।

ফিরে আসার আগের দিন তাঁদের *পূর্ণ ছবির মগ্নতা* উপন্যাসটি দিলাম। বললাম, এ বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেটা দেব? দু'জনেই একসঙ্গে বললেন, না, বাংলা থাকলে সেটাই দিন। আমরা বাংলা থেকে অনুবাদ করতে চাই। আমি তাঁদের বাংলা বইটি দিলাম। তাঁরা হাসিমুখে চলে গেলেন।

যাবার দিন সকালে নতুন সাহিত্য পরিষদের দু'জন সদস্য এলেন দেখা করতে। বললেন, আমরা আপনার 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পটি অসমীয় ভাষায় অনুবাদ করেছি। ছাপা হয়েছে একটি পত্রিকায়।

এক আনন্দময় সময় কাটিয়ে বের হই হোটেল থেকে। প্রশান্ত ডেকা আর ড্রাইভার রাহুল আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এয়ারপোর্টে। রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘর, জলাভূমি, পাহাড়ি বন দেখে ছাড়ছি গুয়াহাটি। মাথার ভেতর জমে থাকে ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য উৎসব।

সেলিনা হোসেন
কথাসাহিত্যিক

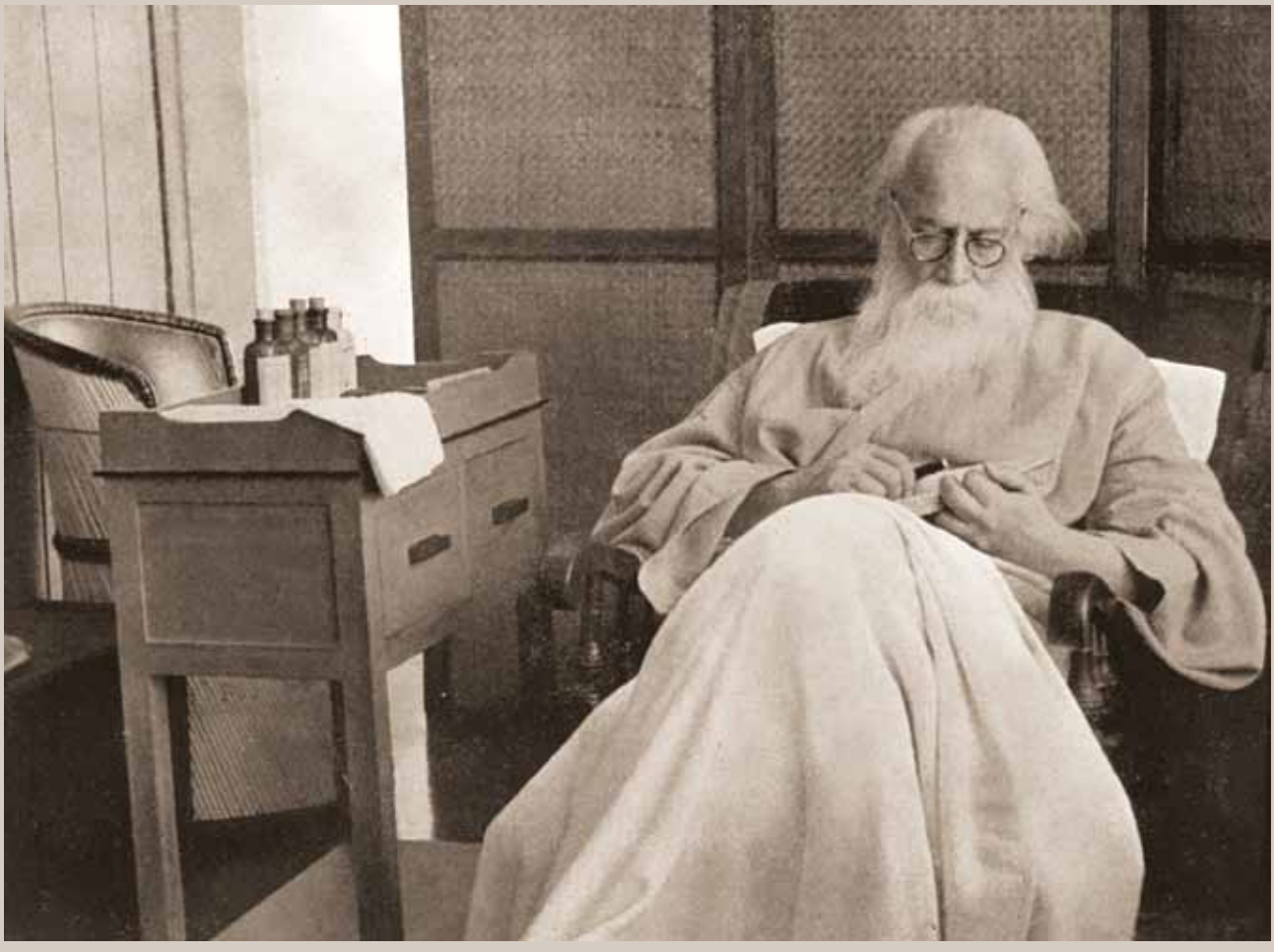

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনা

দীপিকা ঘোষ

রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্ররচনার গবেষকেরা বলেছেন– বিশ্বকবির রচনায় রবার্ট ব্রাউনিংয়ের শিল্পময় দার্শনিকতা, স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ ও লর্ড বায়রনের জীবনমুখী বাস্তবতা, তরুণ কবি জন কিটসের অনিঃশেষ সৌন্দর্যচেতনা, স্বভাবকবি উইলিয়ম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পরিশুদ্ধ প্রকৃতির প্রতি সরল আস্থা ও প্রেম এবং পার্সি বিশি শেলির অতীন্দ্রিয় সত্তার গূঢ় রহস্যময়তার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। যে কারণে তাঁর রচনা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে রবীন্দ্রনাথকে অনন্যসাধারণকরে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের অতুল্য প্রতিনিধিত্বও রবীন্দ্রনাথই পূর্ণ করেছেন। তাঁর লেখনীতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় নির্মিত হয়েছে এমনই এক নতুন রোমান্টিকতার আবহ, যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবন সম্বন্ধে কবির সুগভীর বিশ্বাস ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির নিরবচ্ছিন্ন উৎসারণ থেকে।

বিশ্বকবির ভাবনায় ‘মৃত্যু’ জীবনের আরেক নাম। জন্ম-জন্মান্তর অনন্ত জীবনের যাত্রাপথে পরমাত্মীয়ের মত নতুন নতুন জীবনপথের অনুসন্ধান দিয়েছে সে। মরণ কখনো হয়েছে মহাকালের মিলনদূত। কবির মানস সরোবরে উপলব্ধির বর্ণচ্ছটায় রহস্যময় আবরণ পরে চাক্ষুষ বাস্তবতা অতিক্রম করে তা বিশেষকে ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে নির্বিশেষ।

কবির মৃত্যু ভাবনা প্রসঙ্গেও এ মন্তব্য সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ মরণকেও তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন বিচিত্র রূপের নতুন নতুন পর্যায় অতিক্রম করে। যখন কবির ব্যক্তিগত জীবনে স্বজন হারানোর বেদনা অনাবৃত শোকের আবর্তে আবর্তিত হয়েছে, কোলরিজ কিংবা বায়রনের জীবনমুখী বাস্তবতা তাতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তখন। জীবনের সুধাপাত্র নিঃশেষ করে রিক্ততার অপার বেদনায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যু তখন ধরা দিয়েছে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ত বৈরাগীর মত। আবার বেদনার অনিবার নিঃসরণ সত্ত্বেও এই মরণ কবির ভাবনায় অপরূপ প্লাবন তুলেছে কীটসের সৌন্দর্য চেতনা নিয়ে। শেলির কাছে রহস্যময়তা যেমন নতুন জীবনের প্রেরণা হয়েছে বারবার, তেমনি বিশ্বকবির কাছেও বিমূর্ত চেতনায় মৃত্যু এনেছে নতুন জীবনের সন্ধান। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি প্রেমের মত পরিশুদ্ধ সারল্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও মৃত্যু প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে অবগুণ্ঠন খুলেছে আত্মার প্রণয়ীর মত। আবার এর পরক্ষণেই দেখা যাচ্ছে– দার্শনিক ব্রাউনিংয়ের জীবন গভীরতার সুরও সেখানে ধ্বনিত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় বিচিত্র বৈচিত্র্যের হাতছানির ইশারা নিয়ে।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও বিশ্বকবির ভাবনায় ‘মৃত্যু’ জীবনের আরেক নাম। জন্ম-জন্মান্তর অনন্ত জীবনের যাত্রাপথে পরমাত্মীয়ের মত নতুন নতুন জীবনপথের অনুসন্ধান দিয়েছে সে। মরণ কখনো হয়েছে মহাকালের মিলনদূত। কবির মানস সরোবরে উপলব্ধির বর্ণচ্ছটায় রহস্যময় আবরণ পরে চাক্ষুষ বাস্তবতা অতিক্রম করে তা বিশেষকে ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে নির্বিশেষ। আবার পরক্ষণেই নির্বিশেষ থেকে বিশেষের স্তরে নেমে ব্যক্তিসত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে প্রণয়িনী রাধিকার শ্যামকৃষ্ণ হয়ে। পাশ্চাত্যের লেখকদের সঙ্গে ভাবনার মিল সত্ত্বেও অন্যসব ক্ষেত্রে যেমন বিশ্বকবি একান্তভাবেই একক, তেমনি মৃত্যুভাবনার ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব ভাবনার স্পর্শ নিয়ে মৃত্যুচেতনা এককভাবেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতাকে ছুঁয়েছে।

এর কারণ সূক্ষ্ম মানসিকতার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চিত্ত জীবন জগতের সৌন্দর্য এবং প্রেমের অনুভূতিতে যতই আচ্ছন্ন থাক, মূলত ভারতীয় সন্ন্যাসী ঋষির মত অন্তরে তিনি একজন সত্যান্বেষী দার্শনিক। রহস্যময়তার আড়াল ছাড়িয়ে সত্যের পরমতত্ত্বে তাঁর চিত্ত তাই বিরামহীন আকুলতায় বিচরণ করে ফিরেছে। একদিকে বিশ্বসৃষ্টির সুগভীর দর্শনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে অসাধারণ শিল্পময়তায় অতীন্দ্রিয় সত্তার রহস্যময়তাকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন। অন্যদিকে রহস্যের আবরণ ছিন্ন করতে চেয়েছেন ধ্যানীর ধ্যানের অন্তর্দৃষ্টির পরশ দিয়ে। যেমন উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বলেছেন– ‘এই জগৎ মৃত্যুহীন শাশ্বত সত্তার আনন্দ সম্মিলনের মহাপ্রকাশ। বিশ্বসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ কিংবা অদৃশ্য হিসেবে যা কিছু বিরাজিত, সবই এক চিরসুন্দর, চিরশুদ্ধ অমরনাথের আনন্দময় অভিব্যক্তি। বিশ্বের সকল সৌন্দর্য, পার্থিব জগতের সমস্ত সঞ্চিত সুধা তাঁর থেকে সৃষ্ট বলেই অবিনাশী। অনাদিকাল ধরে তিনিই নানা রূপে বিকশিত। বিশ্বের জীবনপ্রবাহ তাই মৃত্যুহীন। হে অমৃতের অমর সন্তান, এই পরম সত্য জ্ঞাত হয়ে তুমি অমৃততত্ত্ব লাভ করো’। রবীন্দ্রনাথও জীবনের প্রথম প্রভাতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে অমৃতের স্বরূপ বলেই আহ্বান করেছিলেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ‘মরণ’ কবিতায়– ‘মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান। মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট / রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট/ তাপবিমোচন করুণ কোর তব /মৃত্যু অমৃত করে দান’। (*ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*, ১২৮৮)।

সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাই কৈশোর থেকেই ইঙ্গিত দিয়েছিল তাঁর রচনা ঘিরে। ‘হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি / জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি’। (প্রভাত উৎসব, *প্রভাতসংগীত* ১২৮৮) প্রভাতসংগীতের কাল থেকেই তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছে সমগ্র ভুবনের সঙ্গে নিজের জীবনের একাত্মতার আনন্দঘন অনুভূতি। এই আনন্দামৃতের অনুসন্ধান বেদান্তের দার্শনিকেরা রেখে গিয়েছেন সহস্র সহস্র বছর আগে পৃথিবীর অমৃতস্য পুত্রদের জন্য। তবে এই অমৃতলাভ খণ্ডত্বে নয়, অখণ্ড চেতনার উন্মেষ হলেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। যখন এই উপলব্ধি জাগ্রত হয়– নিত্যগতিশীল মহাকালের সঙ্গী হয়ে মানবের জীবনস্রোত চঞ্চলা নদীর মত নিয়ত প্রবহমান, তখনই মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করে। বুঝতে পারে, ক্রমাগত মৃত্যুর স্পর্শ পেয়েই জীবন পুনরুজ্জীবনলাভের আশীর্বাদে ধন্য হয়। ভানুসিংহ মরণকে তাই প্রণয়িনী রাধিকা হয়ে সম্বোধন করে বলছেন– ওগো মরণ, তুমি শ্রীরাধিকার প্রণয়ী শ্যামের মতই প্রিয়তম আমার কাছে! শ্যামের মতই রহস্যময়। আর তাঁরই মত তুমি সর্বতাপ বিমোচনকারী অনিন্দ্যসুন্দর!

এখানে এই কথাটি বলে রাখা ভাল, মৃত্যুভাবনার যে বিকাশের স্তরগুলো রবীন্দ্র রচনায় ধরা পড়ে, সেটা রবীন্দ্র দর্শনের তাত্ত্বিক দিক নয়। রোমান্টিক কবি মনে অরূপের সান্নিধ্যলাভে সৌন্দর্য আর প্রেমের রাজ্যে বিচরণ করতে করতে বিচিত্রের আস্বাদন। কবি তাই জীবনের নব নব সংগীতের কুসুম ফোটাতে চেয়ে, হাসিকান্না বিরহমিলনভরা ধূলির ধরণী ছেড়ে, মানুষের মাঝে পড়ে থাকার আকুলতা নিয়ে যে মুহূর্তে তীব্র বিষণ্ণতায় বলে ওঠেন– ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই’ (প্রাণ, *কড়ি ও কোমল* ১২৯৩), ঠিক তার পরের মুহূর্তেই *উৎসর্গের* ‘জন্ম ও মরণ’ কবিতায় এসে বলেন– ‘নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে / নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে। কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে / এক ধরাতল মাঝে শুধু এক রূপে / বাঁচিয়া থাকিতে’! (জন্ম ও মরণ, *উৎসর্গ* ১৩১০)।

কবির বিশ্বাস, মরণের শতধারায় ধৌত হয়েই জীবনের সংকীর্ণতা অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্তি ঘটে মানুষের। অন্তরের আনন্দরস মৃত্যুর বিচ্ছেদবেদনা থেকে উৎসারিত হয় বলেই মানুষ তাতে উপভোগ করে শাশ্বত অমৃতের পরশ। পার্সি বিশি শেলি বিষাদের গভীর নিমগ্নতার ভেতরে এভাবেই খুঁজতে চেয়েছিলেন অফুরান আনন্দময়ের রহস্যময় সম্ভার– ‘আওয়ার সুইটেস্ট সঙ্‌স্ আর দোজ, দ্যাট টেল অফ স্যাডেস্ট থট! / আই হ্যাভ ড্রাঙ্কেন ডিপ অফ জয়, এন্ড টেস্ট নো আদার ওয়াইন টুনাইট!’ (টু দ্য স্কাইলার্ক)। কবি বলছেন– জীবনের মধুরতম সংগীত হয়ে ওঠে সেগুলোই, যারা বিষণ্ণতম বেদনার কথা বলে। সেই বেদনার রসে তলিয়েই গভীর আনন্দে মাতাল হয়েছি আমি। আজ রাতে তাই আর অন্য মদ পান করতে চাই না। পরিশুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গলাভে ধন্য হওয়া কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাতেও ধ্বনিত হয়েছে– ‘এ সিম্পল চাইল্ড / দ্যাট লাইটলি ড্রস ইটস ব্রেথ / এন্ড ফিলস ইটস লাইফ ইন এভরি লিম্ব / হোয়াট শুড ইট নো অফ ডেথ’? (উই আর সেভেন)। একটি নিষ্পাপ সরল শিশু যখন তার ছোট ছোট নিঃশ্বাসের টানে দেহের প্রতি অঙ্গে-অঙ্গে জীবনের উপস্থিতি অনুভব করে, মৃত্যুর ধারণা তার থাকে কোথায়?

রবীন্দ্রনাথও এই দর্শনে বিশ্বাসী যে, এই বিশ্বজগতে যা কিছু অস্তিত্বময় সবই সেই চিরপবিত্র বিশুদ্ধ নিষ্পাপ শাশ্বতের থেকে উৎপন্ন বলে মৃত্যুর বিশ্বাস আমাদের থাকা উচিত নয়। কারণ যে অসীম প্রাণপ্রবাহ অনাদিকাল

ধরে বিশ্বনৃত্যের ছন্দে ছন্দে প্রবাহিত, কোন অবসান নেই তার। যাকে মৃত্যু বলে বিশ্বাস করে শোকের বেদনা অবহ হয়ে ওঠে সেটি এক ধারণামাত্র। প্রিয়জন যখন নয়নের সমুখ থেকে অপসারিত হয়, তখনো সে হারিয়ে যায় না চিরতরে– 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই / নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই, / আজি তাই / শ্যামলে শ্যামল তুমি / নীলিমায় নীল। (ছবি, *বলাকা*, ১৩২১)। কারণ জীবনের পরিসমাপ্তি একটি সুনির্দিষ্ট দেহের মধ্যে নয়। নব নব পরিচিতির ভেতর দিয়ে অনন্তকাল ধরে যাত্রাপথে তার পথচলা।

এই যাত্রাপথ রচিত হয় বারংবার মরণের সিংহদ্বার দিয়েই। আদিঅন্তহীন কাল থেকে সম্ভবত পৃথিবী সৃষ্টিরও বহু পূর্ব থেকে, যে প্রাণপ্রবাহ স্পন্দিত হয়েছিল সৃষ্টির কারণ-সমুদ্র গর্ভে, সেই প্রাণ আজও তেমনি অনিঃশেষভাবে অশেষ। রবীন্দ্রনাথ তাই ছিন্নপত্রে লিখেছেন– 'আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলচে, তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম। নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম। এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম'। (*ছিন্নপত্র*, শিলাইদহ ১৮৯২)।

কবি তাঁর সংখ্যাহীন জন্ম-জন্মান্তরের কথা আজও তাই বিস্মৃত হননি– 'মনে আজি পড়ে সেই কথা / যুগে যুগে এসেছি চলিয়া / স্খলিয়া স্খলিয়া / চুপে চুপে/ রূপ হতে রূপে/ প্রাণ হতে প্রাণে। (চঞ্চলা, *বলাকা* ১৩২১)। মরণ যদি বিনাশসাধনই ঘনিয়ে তুলবে সবার জীবনে তাহলে জীবন থেকে জীবনান্তরে এই যে অশেষভাবে পথ চলার সহস্র স্মৃতির আনাগোনা, সেটা কেমন করে সম্ভব? তাই বিনাশসাধন নয়, নিরন্তর চলার জন্যই মৃত্যুর স্পর্শলাভে দেহের খোলস বদলে যায় বারংবার। কারণ এমন বদলেই সম্ভব হয়– নানা রূপ পরিগ্রহের ভেতর দিয়ে বিবিধ বৈচিত্র্যের আস্বাদন।

মৃত্যু তাই কখনো প্রণয়ী হয়ে, বাউল হয়ে, কখনো বা বালিকাবধূর বরের বেশে, সখা সেজে বন্ধুরূপে, অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষার মত অবগুণ্ঠনের আবরণ পরে, অরুণবহ্নির রুদ্র সাজে, জীবনরথের সারথি হয়ে, ললিত লোভন মোহন রূপে কিংবা জ্যোতির্ময়ের পরশমণি হয়ে ধরা দিয়েছে কবির ভাবনায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন বিশ্বরহস্যের গভীর স্পর্শ অনুভব করেছেন সূক্ষ্ম উপলব্ধির গভীরতম সৌন্দর্যে। গভীরতম অন্তরের প্রেমে। তাঁর মগ্নচেতনায় বেদান্ত দর্শনের সেই সত্যটিও জাগ্রত ছিল সদা সর্বদা যা আধুনিক বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ঈশ্বর কণা তত্ত্বরূপে'। অর্থাৎ জগতে কোন কিছুই শেষ হয়ে যায় না, পরিবর্তিত হয় মাত্র। কারণ বিশ্বের সবকিছুই একটি অশেষ সত্তা থেকে উৎপন্ন। জীবন-মৃত্যুর নিঃশব্দ প্রণয়খেলা কবির কাছে বহুবার তাই নবজীবন, নবযৌবন লাভের আহ্বান নিয়ে এসেছে– ' অত চুপি চুপি কেন কথা কও / ওগো মরণ হে মোর মরণ, / অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও / ওগো একি প্রণয়েরই ধরন'! (মরণ মিলন, *উৎসর্গ* ১৩১০)। 'ফাল্গুনী' নাটকেও কবির তাই বক্তব্য– 'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পেতে হবে। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলেই জীবনকে সে পায়নি। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন'। (ফাল্গুনী, ১৩২২)

উপসংহারে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ভাবনায় বিকাশের যে স্তর সেটা কবির হৃদয়ের বিচিত্র ভাবানুভূতি এবং কল্পনার বর্ণচ্ছটার এক অপরূপ সম্মিলন। তাঁর কবিসত্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পার্সি বিশি শেলির মত রহস্যময় অতীন্দ্রিয় সত্তার গূঢ় অনুভূতি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কীটসের অনিঃশেষ সৌন্দর্যচেতনায় অবগাহন। উইলিয়ম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত শৈশব থেকে প্রকৃতিপ্রেমী হওয়ায় প্রকৃতির অবির্চনীয় রসতরঙ্গের মধ্যে বিশ্বরহস্যের গভীর রহস্য একাত্ম করে তিনি মৃত্যু ভাবনাকে একাকার করে দিয়েছেন। আবার কোলরিজ কিংবা বায়রনের বস্তুগত অভিব্যক্তির অভাবও সেখানে নেই। আছে মননশীল লেখক ব্রাউনিংয়ের মত গভীর দর্শনের শিল্পময় বিশ্লেষণও। কিন্তু তারপরেও এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এই– জগতের সর্বত্রই তিনি উপলব্ধি করেছেন চির শাশ্বতের পরিব্যাপ্ত আনন্দ তরঙ্গকে। যে আনন্দের তরঙ্গে ভেসে মরণের শোকময় বিষাদও লোভন মোহন ললিত বরের বেশ ধারণ করেছে। মৃত্যু হয়ে উঠেছে জীবনের চিরপ্রার্থিত প্রণয়ী। কারণ কবির কাছে জগতে মৃত্যু বলে কিছু নেই। মরণ মূলত নতুন জীবনলাভের একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ামাত্র।

দীপিকা ঘোষ
প্রবাসী প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ আগস্ট

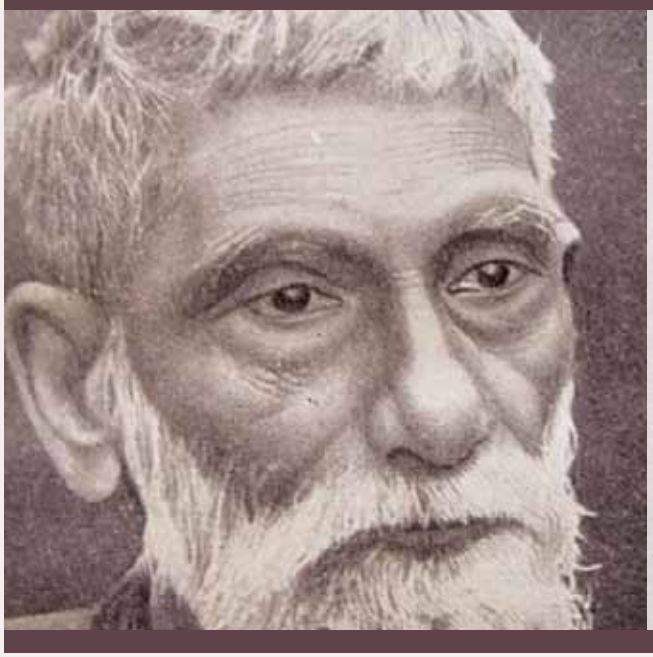
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

- ০২ আগস্ট ১৮৬১ ❖ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম
- ০৪ আগস্ট ১৯২৯ ❖ কিশোরকুমারের জন্ম
- ০৭ আগস্ট ১৮৬৮ ❖ প্রমথ চৌধুরীর জন্ম
- ০৭ আগস্ট ১৯২৫ ❖ কৃষিবিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথনের জন্ম
- ০৭ আগস্ট ১৯৪১ ❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
- ১১ আগস্ট ১৯০৮ ❖ ক্ষুদিরামের ফাঁসি
- ১২ আগস্ট ১৯১৯ ❖ মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের জন্ম
- ১৫ আগস্ট ১৮৭১ ❖ ঋষি অরবিন্দের জন্ম
- ১৫ আগস্ট ১৯২৬ ❖ কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম
- ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ❖ ভারতের স্বাধীনতা দিবস
- ১৮ আগস্ট ১৯৩৬ ❖ গীতিকার পরিচালক গুলজারের জন্ম
- ২০ আগস্ট ১৯১২ ❖ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম
- ০২ আগস্ট ১৯২২ ❖ বিমল মিত্রের জন্ম
- ২৩ আগস্ট ১৮৯৮ ❖ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
- ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ ❖ কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু
- ৩১ আগস্ট ১৫৬০ ❖ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম

প্রাণময় তবুও সময়

মাহমুদ কামাল

সকাল বিষণ্ন হলে অতিদ্রুত দুপুরে গড়ায়
সকাল প্রসন্ন হলে সেভাবেই দুপুর চঞ্চল
বিষণ্ন দুপুর ক্রমে বিকেলের মনমরা রোদ
প্রসন্ন দুপুর হয় আলোড়িত বিকেলের ঘ্রাণ
এভাবেই সন্ধ্যা ও রাত বিষণ্ন বিবর
এভাবেই সন্ধ্যা ও রাত প্রসন্ন মদিরা
সকাল কি বিষণ্ন হয়? অথবা প্রসন্ন?
সময়ের প্রাণ নেই প্রাণময় তবুও সময়
বিষণ্ন প্রসন্ন আর প্রখর চঞ্চল
সব অনুষঙ্গ ফেলে অতিদ্রুত সময় নির্বাণ
যা কিছু বিষণ্ন আর যা কিছু প্রসন্ন
যোগ কিংবা বিয়োগের হিসেব-নিকেশে
জীবনের অর্থটুকু মৃত্যুর পরিসীমানায়
ছুটে চলে মুহূর্ত সকল।

সমুদ্রের গর্জন

মোয়াজ্জেম হোসেন

সমুদ্রের জল থেকে সূর্য গান গেয়ে
আকাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।
সেই আলোয় রচিত হচ্ছে নতুন প্রভাত।
রাত্রির আঁধারই প্রভাতের রূপ নিয়ে প্রহর গুনছিল।
আমিও সারারাত সমুদ্রতটে একা একা–
মৌনগীতির কল্পনায় বিভোর ছিলাম।
বহুযুগের শূন্য বেদনায় প্রাণে প্রেমের কম্পন অনুভব করছিলাম।
ভোরের পূর্ণ প্রহরে দিগ্বিদিক আলোর ছটায়
যখন ঝল্‌মল্ করছে;
তখন মধ্য সমুদ্রে জলের তরঙ্গ উঠল।
ধীরে ধীরে ভেসে উঠল সোনালি চুলের সেই জলকন্যার শরীর।

আমার দেহমন,
সুরের আবেশে সমুদ্র পারের প্রজাপতির সঙ্গে উড়তে লাগল।
সূর্য সরে যেতে লাগল আকাশ থেকে আকাশে।
তারপর জলকন্যার সোনালি চুলের ঘ্রাণ যখন বাতাসে ভাসছিল–
সেই মুহূর্তে গর্জে উঠল সমুদ্র।

এই বরষায়

রবীন্দ্রনাথ অধিকারী

আমি ভালবাসি বরষার মেঘ
মেঘ থেকে বৃষ্টি নামল
জলের ধারায় পথ থামল
তুমি তখন ছড়িয়ে দিলে বেগ

বৃষ্টি তুমি ভেসে ভেসে
আমায় তুমি ভাসিয়ে দিলে
ঊর্মিমালার সাগর নীলে
এই বরষায় হেসে হেসে

বৃষ্টি তুমি এঁকে দিলে স্বপ্ন-কাজল
এই হৃদয়ে ফুল ফুটল
ফুলে ফুলে অলি জুটল
এই বরষায় হৃদয় টলমল

বরষা তুমি কালো হরিণ কালো মেঘের ছায়া
তোমার জন্য এই বরষায় ছুঁড়ে দিলাম বৃষ্টিমুখর মায়া
মেঘ তোমাকে ভালবাসি মন-উদাসী
তোমার জন্য ভুবন-জোড়া রইল হাসি, বইল হাসি
মেঘ তোমাকে ভালবাসি, মেঘমালার জলরাশি
হৃদয় ধুয়ে এই বরষায় ভালবাসি, ভালবাসি।

প্রেম ও বিপ্লবে তুমি নজরুল

সোহরাব পাশা

দীর্ঘ অন্ধকার ভাল লাগেনি তোমার
ভোরের দরোজা খুলে পাখিদের আগে
শুনিয়েছ তুমি মুখর রৌদ্রের গান
পৃথিবীর নিত্য আয়োজনে;

ছেঁড়া মেঘের পাতার নিচে নিম্নমুখী যে জীবন
অন্ধ মৃত বাসনায় যারা খুঁজে ফেরে
জ্যোৎস্নার শিশির স্বপ্নভোর– রাত্রি শেষে
কালি-ঝুলিমাখা কয়লার পাশেই হঠাৎ ঘুমিয়ে
পড়া ক্লান্তির জীবন অজস্র মেঘলা কুয়াশার
ভিড়ে যারা আকাশ দেখতে ভুলে যায়
তুমি ওই সব মানুষের বিপন্ন বিষণ্ন গূঢ়
জীবনের বিনয়ের তীব্র দ্যুতি উজ্জ্বল অম্লান

তুমি জেগে আছ প্রতি ভোরে
সকাল সন্ধ্যায়, বিনিদ্র রাত্রির চোখে
মানুষের মন ও মননে
প্রেম ও বিপ্লবে জ্যোর্তিময়
ল্যাম্পপোস্ট।

বাঘবন্দী

সুজন হাজারী

বাবরের বিধ্বংসী কামানের গোলা
পানিপথ যুদ্ধে শত্রুর মোকাবেলা
পলায়ন পথ পাহারায়
রুমালে মুখ বাঁধা ইভটিজার
সনাক্তে ব্যর্থ ফরেনসিক ডাক্তার
অপবাদ থেকে বাঁচল ধর্ষিতা

জ্যামিতির জটিলতা
ত্রিভুজের কোন বিন্দুতে থামে
বাঘবন্দীর গুটি খেলা
জানে কেবলই গণিতজ্ঞ

সেনা ছাউনির নিরাপত্তা
রাষ্ট্রীয় পোশাক পরা
গোপনে ঢাকা বহিরঙ্গ

গোয়েন্দার কড়া নজরদারি
জজ মিয়ার সাজানো উপাখ্যান
ভ্রুক্ষেপহীন উড়াল বিমানে
তনুর খুনীরা পলাতক অজানা সুদূরে

রঙচটা ফ্যাকাশে বিকেলবেলা
মিডিয়ার অধিক অনুসন্ধানে
মেলেনি তনুর সন্ধান

আত্মগোপনে যাওয়ার আগে

ফকির ইলিয়াস

মানুষের মন স্থিতিশীল নয়। পাথরের ওজন বাড়ে–
কমে গ্রীষ্মে, বসন্তে। বর্ষায় নদীর যৌবন দেখে গর্বিত
হয় যে তীর, শরতে সে-ও পালন করে কাশফুলসন্ধ্যা।
কিছু মেঘ উড়ে যায় অজানায়। যাওয়ার আগে জানিয়ে
যায় দাগ এবং দরদের দূরত্ব। কীভাবে মানুষের একান্ত
পাহারাদার হয়ে কাটিয়েছিল যুগের পর যুগ লেখে সেকথাও।

জীবনের বাঁক সমান্তরাল নয়। আত্মগোপনের যাওয়ার আগে
যে ঋষি, নিজের বসন পুড়িয়ে দেন আগুনে–
তিনি জানেন সাধনার শহরে বসবাস করে কত বিচ্ছেদ
কত প্রেমের পরিধান সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে যোগিনীরা
পালন করেন হৈমন্তী সন্ন্যাস। আর যারা আত্মগোপন করতে
পারে না, তারাই থেকে যায় মৌন সভাঘরে,
পুরনো বিরহের চন্দ্রদাস।

সুরের সন্ন্যাস

শেখর দেব

ছাতিমের গন্ধ ভরা দেশে হেঁটে যাই বহদূর
পথের সীমানা জেনে কেউ কি পায় বল ঠিকানা?
নিরুদ্দেশ তাই শুধু চলে যাই দূর অন্তঃপুর
বাঁশির মধুর সুর ভেসে আসে ভেঙেছে সীমানা।
সুরের মায়ার ডাকে যে জন গিয়েছে ছেড়ে ঘর
মোক্ষলাভ বৃথা নয়, ধ্যানের সুরভি ভেঙে যায়
বোধ আর বোধি নিয়ে একা শুধু হতে হয় পর
সাধন সঙ্গিনী যদি কাছে থাকে মন নিরূপায়।

নীলাম্বরী, ওগো মেঘবতী, এমন অমোঘ কলা
কেমনে ধরেছে মন, সুরহীন কি করে তোমাকে
টানে? মানে না সে-সব মন, ভুল স্রোতে শুধু চলা।
এসব আমূল গন্ধ এসেছে দারুণ করে নাকে।
সীমাহীন তাই শুধু পথের মায়ার মধু নিয়ে
ঘুরিফিরি সব পথ বাঁশিসুরে বেদনা লুকিয়ে।

বাংলায় কথা বলে

সন্তোষ ঢালী

আমি বিস্মিত হই– সবাই বাংলায় কথা বলে–
এখানের নদীগুলো সারাক্ষণ বাংলা বলে,
বয়ে যেতে যেতে ঘাটে ঘাটে থেমে রাখাল বালকের মত
গেঁয়ো বধূদের সাথে ফিস্‌ফিস্ কথা কয়;
ঠুমরি কিংবা গজল নয়, এখানের কোকিলেরা বাংলায় গান করে
ভোরের দোয়েল সেও বাংলায় শিস্ দেয় ঘুম ভাঙায়,
আমি বুঝতে পারি তাদের সবার কথা মা যেমন বোঝে সন্তানের;
চিনে কাউন কিংবা বৈশাখের ধানক্ষেতে বাতাস ঢেউ খেলে যায়
কী মধুর সুরে বাংলায় বলে যায়– ভাল আছি ভাল থেকো
রাখালের বাঁশি কী মায়াবী সুরে বাংলায় বেজে যায়;
আমার আশ্চর্য লাগে! কী করে সবাই বাংলায় বেজে চলে অবলীলায়!
এখানে উৎসারিত প্রতিটি শব্দ প্রতিটি ধ্বনি বাংলায়– ভেবে আকুল হই।
বিলের পাড়ে তির্‌তির্ খঞ্জনা নেচে যায়, সেও বাংলায় নাচে
একতারা দোতরা কিংবা খোল করতাল ঢোল কী করে বাংলা জানে
কূল পাই না ভেবে কোনমতে।
কচিকচি পাতারা ফুলেরা এখানে সারাক্ষণ বাংলায় হাসে
কষ্ট পেলে বিরহী নারীর মত বাংলায় কাঁদে,
পাখিদের মাছেদের গাছেদের সাথে সন্তর্পণে কথা বলে দেখেছি
সকলেই বাংলায় কথা বলে–
আমার বাংলা, আহা রে আমার বাংলা, কী যাদু জানে–
এই বাংলার খাল বিল নদী নালা প্রকৃতি সবাই
মনের কথা প্রিয় বাংলায় বলে–

ভ্রমণ

গান্ধীজীর দেশে আমরা

নওশাদ জামিল

• পূর্ব প্রকাশিত-র পর

তিন.

সফরের তৃতীয় দিন ছিল ৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। দিনভর আমরা ঘুরি মুঘলদের নির্মিত ঐতিহাসিক দু'টি স্থাপনায়। প্রথমে ঘুরে দেখি মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পত্নী মমতাজের সমাধি। তারপর আকবর, জাহাঙ্গীর আর শাহজাহানের বসবাসস্থল আগ্রা দুর্গও দেখা হয়। নয়াদিল্লির দ্য অশোক হোটেল থেকে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে যাত্রা শুরু করি আগ্রার দিকে। সারা শহর যেন কুয়াশার চাদরে ঢাকা। আমরা কুয়াশা ভেদ করে ছুটে চলি মুঘল ঐতিহ্য পানে। মূল শহর থেকে বেরিয়ে বাসবহর এগিয়ে চলে তীব্র গতিতে। চারদিকে মাঠ, প্রান্তর, নদী পেরিয়ে বাস যাচ্ছে আগ্রার দিকে। বাস চলছিল, তখন তালে তালে বাসের ভেতর চলছিল গানের আসর। গাড়ির ভেতরেই তৈরি হয়ে যায় 'বাক্কাস টিভি' নামে একটি গানের দল। দলটির সদস্যরা নেচে-গেয়ে মাতিয়ে রাখে যাত্রাপথ। দুপুরের আগেই আমাদের বাসবহর থামে তাজমহলের গেট থেকে কিলোমিটারখানেক দূরে। সেখান থেকে মিনিবাসে তাজমহলের গেটের সামনে নামেন ১০০ তরুণ-তরুণী। সঙ্গে তিনজন গাইড। গাইডদের মুখে শোনা যায় তাজমহল নির্মাণের ইতিহাস।

আমরা এসেছি প্রেমের অমরকাব্য তাজমহল দেখতে। সারাটি দুপুর ঘুরে-ফিরে দেখি এই স্থাপনার নানা অংশ। ঝলমলে রোদ্দুরে সফেদ তাজমহল দেখতে দেখতে কখন যে সময় কেটে যায়– মুগ্ধতার ঘোরে আমরা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। গম্বুজাকৃতি এই অনিন্দ্যসুন্দর সমাধিসৌধের শুভ্রতার আভিজাত্যে মন ভরে যায়। নান্দনিক নকশায় তৈরি এই সৌধ যেমন সুন্দর, তেমনই সুন্দর চারপাশের প্রকৃতি। তাজমহল সংলগ্ন যমুনা থেকে উড়ে আসা বাতাস আমাদের মধ্যে এনে দেয় এক স্বর্গীয় আবহ। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় স্ত্রী আরজুমান্দ বানু বেগম (যিনি মমতাজ মহল নামে পরিচিত) তাঁদের এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন।

প্রিয় স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাহত সম্রাট শাহজাহান নির্মাণ করেন অপূর্ব সৌধটি। জানা যায়, তাজমহলের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে। অনিন্দ্যসুন্দর এই সৌধ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নকশার উপর, বিশেষ করে পারস্য ও মুঘল স্থাপত্য অনুসারে। তাতে রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যেরও ছায়া। তাজমহলে মমতাজ মহল ও শাহজাহানের স্মৃতিফলক রয়েছে।

প্রিয় স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাহত সম্রাট শাহজাহান নির্মাণ করেন অপূর্ব সৌধটি। জানা যায়, তাজমহলের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে। অনিন্দ্যসুন্দর এই সৌধ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নকশার উপর, বিশেষ করে পারস্য ও মুঘল স্থাপত্য অনুসারে। তাতে রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যেরও ছায়া। তাজমহলে মমতাজ মহল ও শাহজাহানের স্মৃতিফলক রয়েছে। তাঁদের কবরও রয়েছে। যমুনার পারে এ ঐতিহাসিক স্থাপনা ঘুরে দেখে আমরা কাটিয়ে দিই সারাটা দুপুর।

তারপর দুপুরের খাবার সারি আগ্রার একটি অভিজাত রেস্তোরাঁয়। এখন আমরা যাব মুঘলদের আরেকটি ঐতিহাসিক স্থাপনা আগা দুর্গে। তাজমহল দেখার আবেশ কাটতে না কাটতেই বিকালে আমরা উপস্থিত হই আগ্রা দুর্গের বিশাল ফটকের সামনে। সারাটি বিকাল কাটিয়ে দিই এ দুর্গের ভেতর।

তাজমহলের মত এ দুর্গটিও যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের আগ্রায় নির্মিত এ দুর্গ থেকে দেখা যায় তাজমহলও। সম্রাট শাহজাহান শেষ বয়সে যখন বন্দী ছিলেন আগ্রা দুর্গে, সেখান থেকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন তাঁর অমর সৃষ্টি তাজমহলের দিকে।

লালচে বেলেপাথর দিয়ে তৈরি এই দুর্গ। যেমন বিশাল, তেমন সমৃদ্ধ। দুর্গটির অভ্যন্তরে অনেক প্রাসাদ মিনার ও মসজিদ রয়েছে। এখান থেকে দীর্ঘদিন ভারত শাসন করতেন মুঘল সম্রাটরা। বিকালের রক্তিম আলোয় ঘুরে দেখি খাস মহল, শীশ মহল, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, মোতি মসজিদ, নাগিনা মসজিদসহ দুর্গের নানা স্থাপনা। তারপর রাতে আমরা ফিরি দিল্লিতে, দ্য অশোক হোটেলে।

চার.

সফরের চতুর্থ দিন ছিল ৭ ডিসেম্বর, বুধবার। দিল্লিতে আমাদের শেষদিন। তারপর রাতের প্লেনে আমরা উড়াল দেব গুজরাটের আহমেদাবাদের উদ্দেশে। সেদিন সকালে ঘুরে দেখি প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্র। সেখানে ছিল মহাত্মা গান্ধীর দুর্লভ আলোকচিত্র নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনী। আমারা ওই প্রদর্শনী দেখে রওনা হই কুতুব মিনারের দিকে।

দিল্লি থেকে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণে কুতুব মিনার। বিশ্বের সর্বোচ্চ ইট নির্মিত মিনার। আশেপাশে অনেক প্রাচীন, মধ্যযুগীয় স্থাপনা ও ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সব মিলিয়ে একে বলা হয় কুতুব কমপ্লেক্স। ১০০ একর জমির ওপর স্থাপিত এই কমপ্লেক্সের ভেতর রয়েছে কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, আলাই মিনার, আলাই গেট, সুলতান ইলতুৎমিশ, সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন, সুলতান আলাউদ্দিন খলজী প্রমুখের কবর।

দুপুরভর ঘুরে দেখি এই বিশাল স্থাপনা। সুউচ্চ মিনার যেমন কারুকার্যময়, তেমনই নান্দনিক। ভারতের প্রথম মুসলমান শাসক কুতুবুদ্দিন আইবেকের আদেশে কুতুব মিনার নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১১৯৩ সালে। তবে মিনারের উপরের কাজ শেষ করেন ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দে। দিল্লির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই স্থাপনা দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করেন অসংখ্য পর্যটক। দিনভর পর্যটকের আনাগোনায় গোটা এলাকা থাকে জমজমাট।

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কুতুব মিনার এবং কমপ্লেক্সের ভেতর অবস্থিত ঐতিহাসিক নানা ভবন ও সৌধ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাতেও রয়েছে এই মিনার। জানা যায়, আফগানিস্তানের জাম মিনারের আদলে এটি নির্মিত হয়। পাঁচতলা বিশিষ্ট মিনারের প্রতিটি তলায় রয়েছে ব্যালকনি। তাতে রয়েছে ঝুলন্ত বারান্দা। লালচে বেলেপাথর দিয়ে তৈরি কুতুব মিনার। মিনারের গায়ে নান্দনিক ক্যালিওগ্রাফি উৎকীর্ণ, তাতে রয়েছে কুরআনের আয়াত। এছাড়া মিনারের প্রাচীরের গায়ে আছে নানা শৈল্পিক অলঙ্করণ।

কুতুব মিনার দেখে আমরা ছুটি এয়ারপোর্টের দিকে। রাতের প্লেনে আমরা যাই ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজের এলাকা গুজরাটে।

পাঁচ.

গুজরাটের আহমেদাবাদ, গান্ধীনগরে ৩দিন অবস্থান করি আমরা। ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে আমরা ঘুরে দেখি টাটা কোম্পানি, রিলায়েন্স গ্রুপ, ডান্ডি কুটির, গান্ধীর আশ্রম, আদালজ স্টেপওয়েলসহ নানা স্থাপনা। গুজরাট টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দু-দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়। তার আগে চলে প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা।

সফরের পঞ্চমদিন ছিল ৮ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। সকাল থেকে রাতঅব্দি আমরা ঘুরে দেখি আহমেদাবাদের নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। গুজরাট সফরের প্রথম যাত্রাই ছিল মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত সবরমতি আশ্রম দেখা। সকাল ৯টার দিকে আমরা আসি এই পবিত্র জায়গায়।

১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফেরেন। তখন তিনি গুজরাটের আহমেদাবাদের এক আইনজীবী বন্ধুর কাছ থেকে কেনেন এই বাড়ি। সবরমতি নদীর তীরে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত বাড়িটিই 'সবরমতি আশ্রম' নামে পরিচিত। এই আশ্রমে থেকেই গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সমাজ পুনর্গঠনের কার্যক্রমসহ নানা কাজ শুরু করেন। দীর্ঘদিন এই আশ্রমে থেকেই তিনি চালিয়ে যান তাঁর অহিংস আন্দোলন, যার ফলে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়।

সকালের নরম রোদে আশ্রমে এসে দেখি– বিভিন্ন স্কুলের শিশু-কিশোররা ঘুরে দেখছে মহাত্মাজীর নানা স্মৃতিস্মারক। পাশেই বইছে সবরমতি নদী। গাছপালা ঘেরা আশ্রমে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন নানা শ্রেণির মানুষ। সবরমতি আশ্রমে এলে বোঝা যায়, কী সাধারণ জীবনযাপন করতেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর ব্যবহার করা জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে এখানে। আশ্রমে আছে গান্ধীর কক্ষ এবং তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধীর রান্নাঘর। আছে গান্ধীর নানা স্মৃতি নিদর্শনও। হিংসার বদলে ভালবাসা, সহিংসতার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী আমৃত্যু অহিংস ও শান্তির নীতিতে চলেছেন, তাঁর জীবন ছিল খুব সাধারণ সহজ সরল।

আশ্রম দেখে আমাদের পরের ভ্রমণ টাটার গাড়ি কারখানা। বিশাল এলাকাজুড়ে অবস্থিত এই কারখানা। আমাদের ঘুরে দেখানো হয়– কীভাবে তৈরি হয় ন্যানো গাড়ি। বিস্ময়কর এক কারখানা। চোখের সামনেই তৈরি হয়ে গেল একেকটি গাড়ি! আমরা ন্যানো গাড়িতে করে ঘুরে দেখি কারখানার নানা অংশ। বিকালে আমরা যাই গুজরাট টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে, সেখানে ছিল প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমরা তুলে ধরি বাংলাদেশের সংস্কৃতির নানা দিক।

বন্ধুপ্রতিম বাংলাদেশ ও ভারতের এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়

উৎসবে ছিল লাইভ চিত্রাঙ্কন। বড় ক্যানভাস ও রং-তুলি নিয়ে মঞ্চে ওঠেন শিল্পী জয়দ্বীপ বাড়ৈ। মজার বিষয়, তাঁর ক্যানভাস ছিল ওল্টানো। উল্টো দিক থেকে শিল্পী শুরু করেন তাঁর আঁকিবুকির কারিশমা। বিখ্যাত গান 'গিভ মি ফ্রিডম'-এর তালে তালে শিল্পী দ্রুতলয়ে আঁকছিলেন চিত্রকর্ম। মিনিট দুয়েক পর ক্যানভাস সোজা করলেন তিনি। সোজা হওয়ার পর সবাই অভিভূত। দেখা গেল ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মুখাবয়ব।

গুজরাটে। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটের আহমেদাবাদে সেদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ সাংস্কৃতিক উৎসব। তাতে বিভিন্ন পরিবেশনায় অংশ নেন বাংলাদেশের একঝাঁক শিল্পী, তেমনই সেখানকার বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লোকজ নৃত্য ও গান তুলে ধরেন গুজরাট টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। জমকালো এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় দু'দেশের সংস্কৃতির ঐক্যতান।

সফরের পঞ্চম দিনে সন্ধ্যায় ছিল গুজরাট টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে দুই দেশের সংস্কৃতি নিয়ে আয়োজিত হয় ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক উৎসব। উৎসবে বাংলাদেশ পর্বে ছিল দেশের তরুণ শিল্পীদের পরিবেশনায় গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, মূকাভিনয়সহ নানা কিছু। আর তাতে ফুটিয়ে তোলা হয় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ভারতের সাংস্কৃতিক পর্বে গুজরাটের তরুণ শিল্পীরা পরিবেশন করেন ওই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। গুজরাটি নৃত্য ও সংগীতের অপূর্ব ঝংকারে গোটা আয়োজনটি ছিল অনবদ্য।

সাংস্কৃতিক এই উৎসবের কথা প্রচার করা হয়েছিল আগেই। ফলে গুজরাটে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের এক মিলনমেলা বসে যায় অনুষ্ঠান ঘিরে। ততক্ষণে বাংলাদেশ ও ভারতের শিক্ষার্থীদের আগমনে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় গোটা মিলনায়তন। শুরুতেই অতিথিরা মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করেন উৎসবের। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গুজরাট টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজুল গাজ্জাল, যুব মন্ত্রণালয়ের রিজিওনাল ডিরেক্টর কমলকুমার, বিশ্ববিদ্যালয়টির ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্বেতা বাম্বুওয়ালা, ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের সমন্বয়ক (গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি) কল্যাণকান্তি দাশ প্রমুখ।

সৌহার্দপূর্ণ সাংস্কৃতিক আয়োজনের শুরুতেই ছিল গুজরাটি রাগপ্রধান গান। হারমোনিয়াম ও তবলার মৃদু লয়ে, ভাবগাম্ভীর্য আবহে শাস্ত্রীয় সুর তোলেন মহিতোষ মেহতা। 'সরস্বতী' বন্দনার এ সুরে গোটা মিলনায়তনে যেন নেমে আসে এক স্বর্গীয় আবহ। এরপর গুজরাটের লোকগান। 'বুশ না ভান মা থায়ে ভাটো পাবানানি' শীর্ষক গানে উঠে আসে ওই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক নিজস্বতা। গান শেষ হতেই ছিল গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যের পরিবেশনা। মঞ্চে আসেন গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে একঝাঁক শিল্পী। তাঁরা ঢোল, করতাল, বাঁশির ঝংকারে তুলে ধরেন গুজরাটের নিজস্ব সংগীতের ধারা। বাজিয়ে শোনান কিছু জনপ্রিয় গানের সুর। এরপর ছিল গুজরাটের লোকনৃত্যের পরিবেশনা। ঐতিহ্যবাহী গারবা নৃত্য আর সংগীতের তালে মেতে ওঠে গোটা মিলনায়তন।

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজের এলাকা গুজরাটের রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। নিজস্ব ধারার সংগীত ও নৃত্যের পরম্পরার ছাপ রাখা হয় উৎসবে। তুলে ধরা হয় এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক নিদর্শন।

উৎসবে ছিল লাইভ চিত্রাঙ্কন। বড় ক্যানভাস ও রং-তুলি নিয়ে মঞ্চে ওঠেন শিল্পী জয়দ্বীপ বাড়ৈ। মজার বিষয়, তাঁর ক্যানভাস ছিল ওল্টানো। উল্টো দিক থেকে শিল্পী শুরু করেন তাঁর আঁকিবুকির কারিশমা। এ সময় ভেসে আসছিল বিখ্যাত গান 'গিভ মি ফ্রিডম'। গানের তালে তালে শিল্পীও দ্রুতলয়ে আঁকছিলেন চিত্রকর্ম। মিনিট দুয়েক পর ক্যানভাস সোজা করলেন তিনি। সোজা হওয়ার পর সবাই অভিভূত। দেখা গেল ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মুখাবয়ব। সব মিলিয়ে মাত্র তিন মিনিটে অসাধারণ একটি চিত্রকর্ম এঁকে দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করেন তরুণ এই শিল্পী। ভারতীয় শিল্পীর আঁকা চিত্রকর্মটি পরে উপহার দেওয়া হয় বাংলাদেশের যুব প্রতিনিধিদলকে।

ভারতীয়দের পর্ব শেষে ছিল বাংলাদেশের ইয়ুথ ডেলিগেশনের একদল সদস্যের নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শিল্পী সুরাইয়া শাকিলা শুক্লা, এ আই রাজু ও দেবলীনা সুরের নেতৃত্বে এ সময় একদল শিল্পী পরিবেশন করেন বেশ কিছু বাংলা গান। শুরুতেই ছিল দেশাত্মবোধক গান 'আমি বাংলায় গান গাই'। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু গান– 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী', 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'। তারপর বাংলাদেশের শিল্পীরা গেয়ে শোনান কিছু জনপ্রিয় লোকগান 'ওরে নীল দরিয়া', 'আমায় ডুবাইলিরে আমায় ভাসাইলিরে' ইত্যাদি। এরপর 'সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী', 'সোহাগ চাঁদ বদনী' গানের সঙ্গে উপস্থিত শ্রোতা-দর্শনার্থীরা মেতে ওঠেন উচ্ছ্বাসে। পরে আবৃত্তি নিয়ে আসেন আরিক আনাম খান, কাজী নজরুল ইসলাম ও মাহিদুল ইসলাম।

তারপর ছিল বাংলাদেশের নৃত্যের জমকালো পরিবেশনা। তাতে অংশ নেন মাহতারিমা শারমীন, প্রিয়ুতি চাকমা, শারমিন জুয়াইরিয়া ইনা প্রমুখ। তারপর ছিল 'সেলফিস সেলফি' শীর্ষক মূকাভিনয় পরিবেশনা। তাতে অংশ নেন বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশনের সদস্য সাজু রায় ও সাদিয়া জান্নাত। তাঁদের মূকাভিনয় পরিবেশনা মুগ্ধ করে উপস্থিত দুই দেশের দর্শকদের।

উৎসবের শেষ পর্বে একই মঞ্চে বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীরা যৌথ ভাবে নৃত্য পরিবেশন করেন। পরে মিলনায়তনের বাইরের মাঠে গানের তালে তালে বৃত্তাকার হয়ে নৃত্য-গীতে মেতে ওঠেন বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পী, শিক্ষার্থীসহ উপস্থিত দর্শনার্থীরা।

ছয়.

সফরের ষষ্ঠ দিন ছিল ৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার। দিনভর আমরা ঘুরে দেখি গুজরাটের আহমেদাবাদে নান্দনিক 'স্টেপ ওয়েল', ধীরুভাই আম্বানি ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে গড়ে তোলা জাদুঘর 'ডান্ডি কুটির' ইত্যাদি। পরে আমরা

দিল্লিতে শেষদিনে দেখি প্রবাসী ডিজিটাল গান্ধী জাদুঘর। প্রবাসী ডিজিটাল গান্ধী জাদুঘরের গ্যালারিজুড়ে হালকা আলোয় শুধু গান্ধী আর গান্ধী। দেয়ালের গায়ে ছবি আর ভিডিও। উপরে ঝোলানো প্রজেক্টর। দেয়ালে সাঁটানো ছবি মনে হলেও আদতে এগুলো জীবন্ত! দেয়ালের ছবিতে বা ভিডিও সিম্বলে হাত ছোঁয়ালেই চলা শুরু করে। গান্ধীজীকে যেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে জীবন্ত করে রাখা হয়েছে।

সন্ধ্যায় দেখি ভারতীয় চলচ্চিত্র *কাহানি*-২। ভোরে আমরা রওনা হই কলকাতার উদ্দেশে।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাট তুলনামূলক শুষ্ক। গ্রীষ্মের সময় থাকে প্রচণ্ড গরম। তবে আমরা যখন গুজরাটে আসি, তখন আবহাওয়া ছিল বেশ মোলায়েম।

গুজরাটের আহমেদাবাদ বেশ উন্নত শহর। রাস্তাঘাট খুব ঝকঝকে, সুন্দর। লোকজনের মুখে শুনি, নরেন্দ্র মোদি এলাকার প্রচুর উন্নয়ন করেছেন, দূর করেছেন নানা সমস্যা। শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও উন্নত। জাতিগত সহিংসতা দূর করা হয়েছে আগেই। বর্তমানে ধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধন সেখানে সুদৃঢ় হয়েছে। রয়েছে সব ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

গুজরাটের অধিবাসীরা সবজিভোজীই বেশি। মাংসও এরা খায়। তবে গুজরাট 'নো বিফ' রাজ্য। গো দেবতার প্রতি গুজরাটীদের ভালবাসার অন্ত নেই। গোটা শহরের রাস্তাঘাটে গরুর অবাধ বিচরণ। শহরের আইল্যান্ড, দোকানের পাশে, রাস্তার মোড় সবখানেই অবাধে বিচরণ করে গরু। শহরের মানুষগুলো অত্যন্ত সহযোগিতাপ্রবণ। যদি কোন গরু হঠাৎ রাস্তার উপর চলে আসে, রাস্তা পার হতে চায় তাহলে গাড়ি থামিয়ে তাদের পার হতে সাহায্য করা হয়।

আহমেদাবাদে গাছপালা তেমন বেশি নয়। তবে চোখ জুড়িয়ে গেল গুজরাটের রাজধানী শহর গান্ধীনগরে এসে, চারদিকে প্রচুর গাছপালা। যেন এক গ্রিন সিটি।

গুজরাটের দ্বিতীয় দিনে সকালে ঘুরতে গেলাম নান্দনিক উদ্ভাবনী এক পানি সংরক্ষণাগারে। মাটির নিচে পাঁচতলা সমান পানি সংরক্ষণাগার। নাম আদালজ স্টেপওয়েল। বলা যায় প্রাকৃতিক উৎস কাজে লাগিয়ে নির্মিত কৃত্রিম পুকুর।

শুষ্ক অঞ্চলে পানি সংরক্ষণের জন্য তৈরি হলেও ধর্মীয় দিক দিয়েও এর গুরুত্ব কম ছিল না। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো সভ্যতার সাক্ষী। ঐতিহাসিক এ স্থাপনা পরিদর্শনের সময় হঠাৎ হাজির গুজরাটের রাজ্যসভার সদস্য ও সর্বভারতীয় যুব বিজেপির সাধারণ সম্পাদক হর্ষ সাঙ্গভি। তাঁর সংসদীয় এলাকায় বাংলাদেশি যুবাদের স্বাগত জানালেন তিনি। কুশল বিনিময় শেষে ডেলিগেশন টিমের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মাত্র ২৭ বছর বয়সে রেকর্ড ভোট পেয়ে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়া এই তরুণ নেতা।

গুজরাটের পর্যটন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পর্যটনের জন্য গুজরাট এখন ভারতের সবচেয়ে ভাল জায়গাগুলোর একটি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন গুজরাটের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। এরপরই মূলত আমাদের পর্যটন শিল্প আরও এগিয়েছে।

২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সাল। গত ১৪ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে গুজরাটে। রাজ্যের নিরাপত্তা বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতের নিরাপদ রাজ্যগুলোর একটি গুজরাট। মেয়েরা এখানে সারারাত বাইরে একা চলতে পারে। এখানে কোন সহিংসতা নেই। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই একদমই নেই। সব মিলিয়ে গোটা রাজ্যজুড়ে বহমান উন্নয়ন ও শান্তির সংমিশ্রণ।

বিকালে আমরা দেখি অত্যাধুনিক এক জাদুঘর। ডিজিটাল ভারত গড়তে দেশজুড়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে মোদি সরকার। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ মিলল দিল্লি ও গুজরাটের গান্ধী নগরের দুটি ডিজিটাল জাদুঘরে গিয়ে। দুটি জাদুঘরই সাজানো ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে। থ্রি-ডি, ফোর-ডি, লেজার প্রজেকশন– কী নেই সেখানে!

দিল্লিতে শেষদিনে দেখি প্রবাসী ডিজিটাল গান্ধী জাদুঘর। প্রবাসী ডিজিটাল গান্ধী জাদুঘরের গ্যালারিজুড়ে হালকা আলোয় শুধু গান্ধী আর গান্ধী। দেয়ালের গায়ে ছবি আর ভিডিও। উপরে ঝোলানো প্রজেক্টর। দেয়ালে সাঁটানো ছবি মনে হলেও আদতে এগুলো জীবন্ত! দেয়ালের ছবিতে বা ভিডিও সিম্বলে হাত ছোঁয়ালেই চলা শুরু করে। গান্ধীজীকে যেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে জীবন্ত করে রাখা হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘদিন ছিলেন গান্ধী। সেখানে থাকাকালীন তাঁর আন্দোলন, রাজনৈতিক ক্যারিয়ার, পড়াশোনা প্রভৃতি বিষয় নানা আলোকচিত্র ও ভিডিওতে প্রকাশ করা হয়েছে। রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে ভারতে তাঁর নানা কার্যক্রমের ক্লিপস।

অন্যদিকে গান্ধীনগরের ডান্ডি কুটিরও এক অত্যাধুনিক ডিজিটাল জাদুঘর। সফরের ৬ষ্ঠ দিন আমরা ঘুরে দেখি জাদুঘরটি। ১৯৩০ সালে গান্ধীর লবণ অন্দোলন স্মরণে লবণের স্তূপের আদলে তৈরি জাদুঘর।

জাদুঘরের স্থাপত্যকর্ম আকর্ষণীয় বটে। ভেতরটা সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। মজার বিষয়, অন্য জাদুঘরের মত কোন কাচঢাকা গ্যালারি নেই এখানে। দর্শনার্থীদের কানে হেডফোন লাগিয়ে নেওয়া হয় এক ঘর থেকে আরেক ঘরে। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কানের হেডফোনে শুরু হয় ঘটনার বর্ণনা। সঙ্গে ভেসে ওঠে ছবি। বর্ণনা করা হয় ইংরেজি ও হিন্দিতে।

জাদুঘরটিতে ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি। ফোর ডি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, লেজার লাইট শো, থ্রি-ডি হলোগ্রাফি ও ডিজিটাল এলইডির মাধ্যমে দেখানো হয় গান্ধীর শৈশব, কৈশোর, প্রবাস জীবন, আফ্রিকায় নিগ্রহ, ফিরে এসে দেশের জন্য আন্দোলন, জেল জীবন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত নানা দৃশ্যকাব্য। কখনও এলইডি স্ক্রিনে, কখনো দেয়ালে লেজারের মাধ্যমে, কখনো সাধারণ ঘরটিকেই হঠাৎ গান্ধীর শৈশবের ঘর বানিয়ে ফেলা, কখনো ডামি তৈরি করে থ্রি-ডি, ফোর-ডি ডাইমেনশনের মাধ্যমে দেখানো হয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা গান্ধীর জীবন ও কর্মকে।

গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগর থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে বিকেলে

গাড়ি এসে থামল সবরমতি-গান্ধীনগর হাইওয়ে সংলগ্ন ফোরডি স্কোয়ার শপিংমলে। মলের পিভিআর প্রেক্ষাগৃহে চলছে শাহরুখ খান-আলিয়া ভাটের 'ডিয়ার জিন্দেগি' ও বিদ্যা বালান-অর্জুন রামপালের 'কাহানি-২'। আমরা দেখি 'কাহানি-২' চলচ্চিত্রটি।

সাত.

সফরের সপ্তম দিন ছিল ১০ ডিসেম্বর, শনিবার। ভোরের ফ্লাইটে আমরা আসি কলকাতায়। বাংলা ভাষার শহরে এসে আমরা বেশ উৎফুল্ল, প্রাণবন্ত। সকালে কলকাতায় নেমেই আমরা দেখতে যাই স্বামী বিবেকানন্দ আশ্রম, পরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। তারপর দুপুরে উঠি হোটেল পিয়ারলেস ইনে। হোটেলে এসে কিছুক্ষণ অবসর মেলে আমাদের। হোটেলের সঙ্গেই নিউমার্কেট। ফলে বিকালে দীর্ঘক্ষণ চলে কেনাকাটা। পরেরর দিন ১১ ডিসেম্বর, রবিবার। শুরুতেই ছিল ইডেন গার্ডেন দর্শন। পরে প্রিন্সেস ঘাট সৌধ দেখে আমরা গঙ্গার তীরে মনোরম হাওয়ায় কাটিয়ে দিই কিছু সময়। শেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গমন। বিকেল ৪টায় বাসে করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমাবন্দরের দিকে যাত্রা। সন্ধ্যায় এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরি আমরা।

আগ্রার যেমন তাজমহল বিখ্যাত, কলকাতাতেও তেমনই পর্যটকদের সেরা আকর্ষণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। গুজরাট থেকে ফিরে আমরা অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিই এখানে। সুন্দর লেক ও বাগান ঘেরা এই অনন্য স্থাপনা ব্রিটিশদের তৈরি। ভিক্টোরিয়ার মূল দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই লক্ষ করি– ফলকে লেখা সৌধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর লর্ড কার্জন রানীর স্মৃতি রক্ষার্থে স্মারক প্রাসাদ ও উদ্যান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। পরিকল্পনা অনুসারে ১৯০৬ সালে শুরু হয় নির্মাণ কাজ। দীর্ঘদিন কাজ শেষে ১৯২১ সালে উদ্বোধন করা হয় প্রাসাদটির।

সফেদ মার্বেল পাথরে দিয়ে নির্মিত এই সৌধ। জানা যায়, তাজমহল নির্মাণে যেমন রাজস্থান থেকে মার্বেল পাথর সংগ্রহ করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই এই সৌধ নির্মাণেও ব্যবহার করা হয়েছে রাজস্থানের সফেদ মার্বেল পাথর। আর তাতে ফুটে উঠেছে তাজমহলের সুস্পষ্ট ছাপ। ব্রিটিশ ও মুঘল স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রিত সৌধের নকশাকার ছিলেন স্যার উইলিয়াম এমারসন।

বিশাল বাগান ঘেরা এই স্মৃতিসৌধের ভেতর রয়েছে শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্মারক। রয়েছে সমসাময়িক বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা বহু তৈলচিত্র। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা অষ্টাদশ শতকের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নগর কলকাতার ল্যান্ডস্কেপের এক সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। এছাড়াও রয়েছে ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন নথিপত্র, ছবি ও ভাস্কর্য।

চিত্রশিল্পের বিশাল সংগ্রহ সত্যিই ছিল আকর্ষণীয়। এ ছাড়াও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গ্যালারিতে রয়েছে কলকাতা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ইতিহাস। জোব চার্নক প্রতিষ্ঠিত এই নগরী শুরু থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি ও কলকাতার নানা নিদর্শনের আলোকচিত্র রয়েছে গ্যালারিজুড়ে। আছে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, তাতে রয়েছে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক দুর্লভ বই।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উদ্যানও দৃষ্টিনন্দন। উদ্যানে রয়েছে সিংহাসনে বসা রানী ভিক্টোরিয়ার ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য। এ ছাড়াও আছে বিখ্যাত মানুষজনের ভাস্কর্য, আবক্ষ মূর্তি। সবমিলিয়ে এই অপরূপ সৌধ ভ্রমণ ছিল আনন্দদায়ক।

আট.

বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশন টিমের আটদিনের সফরের শেষ দিন ছিল ১১ ডিসেম্বর, রবিবার। হাতে খুব বেশি সময় নেই, ঘোরাঘুরি হবে ঘণ্টা চারেক। সকালবেলাই শুরু হয় শেষদিনের ঘোরাঘুরি। প্রথম গন্তব্য ছিল কলকাতার ঐতিহাসিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইডেন গার্ডেন। উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় এ স্টেডিয়ামের সামনে এসেই প্রাণ ভরে গেল। দৃষ্টিনন্দন স্টেডিয়াম, কত খেলা দেখেছি এখানের, এবার সত্যিই কাছ থেকে দেখলাম সেই স্টেডিয়াম। চারদিকে সবুজ গালিচা, তার পাশে বৃহৎ গ্যালারি। গ্যালারির পেছনে বৃক্ষরাজি– সবমিলিয়ে সত্যিই এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

ইয়ুথ ডেলিগেশন টিমে ছিলেন কয়েকজন খেলোয়াড়। ছিলেন আম্পায়ার। এ মাঠ তাদের কাছে বিশেষ কিছু। ফলের তাঁদের আনন্দটা ছিল বেশি। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব উনিশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান সাদমান ইসলামও সফরসঙ্গী। ঢাকায় ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানের দিন জাতীয় দলের দুই তরুণ স্টার ক্রিকেটার মোস্তাফিজ ও মিরাজ যাকে খুব শিগগিরিই জাতীয় দলে দেখার প্রত্যাশা করেছিলেন। ইডেনে এসে অভিভূত সাদমান। তাঁর আশা, একদিন তিনি খেলবেন এ মাঠে। স্মরণীয় করে রাখবেন তাঁর স্মৃতি।

ইডেন দেখে আমরা যাত্রা করি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি দেখতে। আমাদের বাস এগিয়ে চলেছে চিৎপুর রোড ধরে। দুপুরের ঝলমলে রৌদ্রকণায় দেখা মিলল বিশাল বড় পাকা তোরণ, তাতে লেখা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। রক্ত যেন নেচে উঠল, গুণগুণ করে বেজে উঠল কবিগুরুর সুর। আমরা এসেছি প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য গৃহে, আঙ্গিনায়। এই বাড়িতেই তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা– এই বাড়িতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। সবার মধ্যেই ছিল দারুণ রোমাঞ্চ, কবিকে যেন ছুঁয়ে দেখার আনন্দ।

প্রথমবারের মত এলাম কবিগুরুর জন্মস্থানে, ফলে মনের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল কবির প্রতি ভালবাসা। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত হয়েছিল এই বাড়ি। পরে বাড়িটি হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গাছ-গাছালি ঘেরা লাল ইটের এই বাড়ির সর্বত্রই ছড়িয়ে কবির স্মৃতি। এই বাড়িতেই তিনি লিখেছেন নানা রচনা, তাঁর শেষ কবিতাটিও রোগশয্যায় শুয়ে এখানেই লেখা। বাড়ির দেয়ালে হাত রেখে যেন টের পাচ্ছিলাম কবিগুরুর সান্নিধ্য।

বর্তমানে এখানে নির্মিত হয়েছে কবিগুরু স্মৃতি জাদুঘর, নির্মিত হয়েছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রবেশপথে এককোনায় রাখা আছে কবির ব্যবহৃত গাড়ি। আছে কবির ব্যবহৃত নানা সামগ্রী। জুতা খুলে জাদুঘরে প্রবেশ করতেই ভেসে এল কবিগুরুর সুর। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি ঠাকুরবাড়ির নানা কক্ষ। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখি, কবির ব্যবহৃত জিনিসপত্র সুন্দর করে সাজানো। প্রথম দিকেই আছে খাবার ঘর। এরপর শয়নকক্ষ। তারপর নানা কক্ষ ছড়িয়ে গোটা বাড়িতে। সব ঘরে ছড়িয়ে কবির স্মৃতি, তাঁর নানা স্মৃতিস্মারক। কোথাও ব্যবহৃত পোশাক, তাঁর বইপত্র, আরাম কেদারাসহ নানা জিনিসপত্র। রয়েছে অনেক আলোকচিত্র, শিল্পকর্ম। রয়েছে পরিবারের সদস্যদেরও ছবি। রয়েছে কবির নিজের হাতে লেখা চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপিসহ নানা কিছু।

ঘুরে ঘুরে দেখি গোটা বাড়ি। একটি কক্ষে এসে থমকে দাঁড়াতে হল আমাদের। কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এই কক্ষে। অবিকল আগের মত করে সাজানো হয়েছে ওই কক্ষটি। কবির অপারেশন হয়েছিল যেখানে, সেই খাট, জিনিসপত্র সবই আগের মত করে সাজানো। ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাই এই ঘরেই কবিগুরু তাঁর শেষ কবিতা, 'তোমার সৃষ্টির পথ' মুখে মুখে রচনা করেছিলেন। তার মাত্র সাত দিন পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এই কক্ষে এসে মন কেমন ভার হয়ে গেল। পরে আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি ঠাকুরবাড়ির নানা কক্ষ ও গ্যালারিগুলো। একটি কক্ষে থরে থরে সাজানো কবির চিত্রকর্ম, আছে অন্যান্য শিল্পীর আঁকা ছবিও। সব মিলিয়ে এক জীবন্ত রবীন্দ্রপাঠ।

রবীন্দ্রপাঠ দিয়ে আমাদের রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা শেষ হলেও, লক্ষ করি, আট দিনে আমাদের একটা ভারতপাঠ হয়ে গেল। পাশের দেশ ভারত, সবচেয়ে কাছের দেশও ভারত; কিন্তু ভারতের কতকিছুই আমাদের অজানা, অদেখা। ভারতের বিশাল অদেখা ভুবনের খানিকটা দেখে, বিশাল অজানার খানিকটা জেনে আমরা সত্যিই অভিভূত। কত স্মৃতি জমা হয়েছে মনের কোণায়, কত স্মৃতি জমে রয়েছে করোটিতে, যতদিন বাঁচব তা আনন্দচিত্তে স্মরণ করব। সারাজীবনের জন্য এ স্মৃতি তোলা থাকল হৃদয়ের মণিকোঠায়। জয় হোক বাংলাদেশের, ভারতের। জয় হোক দুই দেশের বন্ধুত্বের।

• সমাপ্ত

নওশাদ জামিল
তরুণ সাংবাদিক

ছোটগল্প

কথোপকথন

নাসরীন মুস্তাফা

টিভিতে খবর পড়ছেন সুকণ্ঠি পাঠিকা। আরেকটি বহুতল গার্মেন্টস ভবনের ধ্বসে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, গতকাল রাতে রাজধানীর ব্যস্ততম আবাসিক এলাকা বকুলতলীতে অবস্থিত ভাই ভাই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির সাততলা ভবনটি বিকট শব্দে ধসে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের শিফট-এ কর্মরত প্রায় সাড়ে তিনশ' শ্রমিক এই ধসে পড়া ভবনটির ভেতর আটকা পড়েছে। তবে কি কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা জানা যায়নি। বিস্তারিত শুনুন তপন শাহ্-র কাছ থেকে।

সুকণ্ঠী পাঠিকা দারুন রূপসীও বটে। শাড়ির সঙ্গে চমৎকার ম্যাচিং মালা। নিখুঁত গড়নের ম্যানেকুইনের মত এক ঠাঁই বসে থেকে ঘাড়টা সামান্য নিচু করে তাকালেন সামনের দিকে। সম্ভাবত তপন শাহ্ কি তথ্য জানাবেন, সেটা তিনিও জানতে চান।

ঘাড়ের ব্যাথায় সোলায়মান কাহিল। তীক্ষ্ণ কিছু একটা মনে হয় ঘাড়ের মাংসে ফুটে গেছে। রক্ত-টক্ত পড়েছে কি না, দেখার উপায় নেই। ঘুটঘুইট্টা আন্ধার চারিদিকে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সোলায়মান মোটেও বুঝতে পারেনি, ও বেঁচে থেকেই জ্ঞানটাকে ফিরে পেয়েছে। ও ভাবছিল, মরে যাওয়ার পর অদ্ভুত আঁধারের ভেতর প্রশ্নকারী ফেরেশতার মুখোমুখি হতে হবে বলেই আল্লাপাক ওকে প্রস্তুত করছেন। বিড়বিড় করে বলে ফেলেছিল, এই তাইলে মরণ!

ঠোঁটের কোণে লেগে আছে এক টুকরো হাসি, অনেকটা পাউরুটি খাওয়ার সময় জেলি লেগে থাকার মত। দেখলেই যেন ইচ্ছে করে, রুমাল দিয়ে জেলিটুকু মুছে দিই যত্ন করে।

টিভির শব্দ যে কোত্থেকে ভেসে আসছে! সোলায়মান শুয়ে শুয়ে শুনছে রিপোর্টিং। চোখ বন্ধ করলেই পাঠিকার মুখখানা মনে করতে পারছে। দু'দিন আগেই সম্ভবত দু'দিন আগে-ই তো... দু'দিন না হোক, তিন দিন হতে পারে... শিফট ইনচার্জ মোস্তাফাকে বলছিল, মাইয়াডা এক্কেরে সুচন্দার কাটিং। মোস্তাফা প্রতিবাদ করে বলল, বেডি এক্কেরে জানি শাবনুর। দু'জন তারপর গবেষণায় মেতেছিল, সুচন্দা আর শাবনুরের চেহারায় এত মিল কেন, সে বিষয়ে। শাবনুর কি সুচন্দার মাইয়া হইবার পারে? সোলায়মান এখন শুয়ে শুয়ে অবষণ্ন মগজের ভেতর খুঁজে পেল সেই প্রশ্নটাই, শাবনুর কি সুচন্দার মাইয়া?

তিন পাশে এ্যাপার্টমেন্ট। মাঝখানে ভাই ভাই গার্মেন্টস সাত তলার সুবিশাল দেহ নিয়ে বিরাট শব্দে ভেঙে পড়েছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া তিন পাশে এ্যাপার্টমেন্ট সব ক'টা ফ্ল্যাটের মানুষজন কাঁদতে কাঁদতে নিচে নেমে আসার জন্য ছোটাছুটি শুরু করছিল। তাতে আহতও হয়েছিল বেশ কয়েকজন। ক্রমশ অস্থিরতা কমেছে। আস্তে আস্তে ফিরে আসছে মানুষজন। সকালের আলো ফুটতেই প্রতিটি ফ্ল্যাটের বারান্দায় ভিড় জমেছে। সবাই ঝুঁকে দেখছে ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে ক্ষতবিক্ষত মানুষ টেনে বের করে আনার দৃশ্য। অত উপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, বের করে আনা মানুষটা জীবিত না মৃত। ডিটেইল জানার জন্য অগত্যা টিভি ছেড়ে দেওয়া। তপন শাহ্, রিনা মালেক, অনুপ রায়দের ক্যামেরার চোখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে সবকিছু দেখার চেষ্টা।

ঘাড়ের ব্যাথায় সোলায়মান কাহিল। তীক্ষ্ণ কিছু একটা মনে হয় ঘাড়ের মাংসে ফুটে গেছে। রক্ত-টক্ত পড়েছে কি না, দেখার উপায় নেই। ঘুটঘুইট্টা আন্ধার চারিদিকে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সোলায়মান মোটেও বুঝতে পারেনি, ও বেঁচে থেকেই জ্ঞানটাকে ফিরে পেয়েছে। ও ভাবছিল, মরে যাওয়ার পর অদ্ভুত আঁধারের ভেতর প্রশ্নকারী ফেরেশতার মুখোমুখি হতে হবে বলেই আল্লাপাক ওকে প্রস্তুত করছেন। বিড়বিড় করে বলে ফেলেছিল, এই তাইলে মরণ! তারপর ঘাড়ের ব্যথাটা তীব্রতর হতে থাকায় আল্লাকে বলেছিল, মরণের পরও ব্যথা থাকে ক্যামনে? ব্যথায় কাতরালে প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক জবাব দেবে কীভাবে? আর প্রশ্নগুলো ভুল হলেই তো দোজখের আগুনে পুড়তে হবে। সামান্য সময়ের জন্য দ্বিধায় পড়ে যায় সোলায়মান। ব্যথাটা কি আগুনে পোড়ার জন্য টের পাচ্ছে, নাকি...? নিজের ভেতরের তাগিদে মনের জোরে ঘাড়ের রগটাকে টান টান করতে গিয়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়া রডের খোঁচা খেয়ে মাকে ডাকতে শুরু করে আর ক্রমশ ফিরে আসে জীবনে।

...এখন সামান্য সময়ের বিরতি। আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন।

....ট্যা ট্যা ট্যা...(মিউজিক)

স্বার্থপর জীবন বেঁচে থাকার অবিরাম উৎসব করছে। এত কিছুর মাঝখান দিয়ে চারিদিক থেকে ভেসে আসা কান্না আর গোঙানির শব্দ চাপা পড়া মানুষেরাই ঠিক মত শুনতে পাচ্ছে না। মন্টু যেমন জ্ঞান ফিরে পেয়েই প্রায় থেঁতলে যাওয়া কানে অল্প অল্প শুনতে পেয়েছিল প্যান্টের পকেটে ঢুকে থাকা মোবাইলটায় বাজতে থাকা ওরে নীল দরিয়া। ওটাকে বের করার চেষ্টা করবে কীভাবে? ছাদ ভেঙে পড়া বিশাল এক স্ল্যাব ওর দু'হাত আর বুকের উপর আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে।

...বিরতির পরে আরো থাকছে, ইরাকে আবারো গেরিলা হামলা।

...ট্যা ট্যা ট্যা...

অসাড় হাত খুঁজে ফিরছে মন। মনে মনেই হাতটাকে কাজে লাগিয়ে মন্টু মোবাইলটাকে প্যান্টের পকেট থেকে টেনে বের করে আনে। তারপর মনের চোখ দিয়ে দেখে স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে ডাক্তারবাজারে ফোনের দোকানদারি করা বেলায়েতের নাম্বার। ও সুইচ টিপে কানে ধরে ফোন। ওপাশ থেকে শেফালি চিৎকার করে ওঠে, মেভাই! আমার মেভাই গো! তুমি বাঁইচা আছ?

রাশিয়া সফররত কন্ডোলিৎসা রাইস বলেছেন, বিশ্বশান্তির জন্য আমেরিকা কাজ করে যাবে।

শেফালি কাঁদতে কাঁদতে আল্লাকে ধন্যবাদ দেয়। বলে, মেভাই, তুমার কিছু হয় নাই তো? তুমার হাত-পাও ঠিক আছে তো?

...ট্যা ট্যা ট্যা...

মন্টু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, হাত-পাওর কুন সাড়া পাইতাছি নারে বইন। বুকের উপর আজদাহা পইড়া আছে। য্যান দশমুনি পাথর। কিয়ামতের দিন মিথ্যুকগো বুকের উপর যিমুন পাথর দিব আল্লা। পায়ের তলায় রড ফুইটা গেছে।

প্রিন্স চার্লস নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে হানিমুনে গেছেন। ওদিকে এক জরিপে জানা গেছে, ব্রিটেনে বেশির ভাগ জনগণ রাজা হিসেবে প্রিন্স চার্লসকে নয়, উইলিয়ামকে চায়।

শেফালি ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চায়, দুই পাও দিয়া হাঁটতে পারবা তো মেভাই?

...ট্যা ট্যা ট্যা...

দুই হাত দিয়ে আমগো সংসারডা টানতে পারবা তো মেভাই?

...ট্যা ট্যা ট্যা...

তুমার কিছু হইলে আমগো কি হইব মেভাই? আমরা না খাইয়া তো মইরা যামু। ও মেভাই গো... শেফালি কাঁদছে। ট্যা ট্যা ট্যা সুরে কাঁদছে মন্টুর কলিজার টুকরা শেফালি। কান্নার দমকে শেফালির দুই বেণী কাঁপছে। কত দিন ঐ বেণী ধরে টেনেছে মন্টু। ব্যথা পেয়ে মা-র কাছে নালিশ করেছে শেফালি। ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদেছে। হাট থেকে বাতাসা নিয়ে এলে তবে মেভাই-এর উপর রাগটা পড়ত ওর।

নরসিংদীতে একটি আম গাছের গোড়ায় কাঁঠাল ধরেছে। উৎসুক জনতা ঠেকাতে র‍্যাব মোতায়েন।

...ট্যা ট্যা ট্যা...

...তোমার জন্য মরতে পারি, ও সুন্দরী, তুমি গলার মালা... বৃত্তাকার কন্ডোমের জন্য বর্গাকার ফয়েল প্যাকই নিরাপদ... ঝাঁঝমাখা নতুন স্বাদের মজা... নিশিতে কল কইরো আমার ফোনে... ক্রিং ক্রিং...

মন্টুর মোবাইল বেজেই যাচ্ছে। শেফালির গলাটা মাঝে মাঝে শোনার জন্য কত কষ্ট করে মোবাইলটা কিনেছিল ও। বেলায়েতের দোকান থেকে ফোন দেয় শেফালি, মন্টুর মোবাইলের ওরে নীল দরিয়া তখন আর বাজতেই পারে না। মন্টু কিভাবে যেন টের পেয়ে যায়, শেফালি ফোন

পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে কমলার প্রেগনেন্সি টেস্টের। গতকাল টেস্টের রিপোর্টটা নিয়ে ম্যানেজারের রুমে ঢোকার পাঁয়তারা করেছে বহুবার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতবার গেছে, শুনেছে মিটিং হচ্ছে, মিটিং। পিএ-কে বার বার বলেছে, ভেতরে গিয়ে স্যারকে ওর নামটা শুধু জানাতে। আগে তো ওর চেহারা দেখলেই পিএ হারামজাদাটা দাঁড়িয়ে যেত, তাজিমের সঙ্গে ম্যানেজারের রুমের দরজা খুলে ওকে ভেতরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিত।

করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধরে বসে। অথচ এখন, ও টের পাচ্ছে, শেফালি পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এসেছে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য। ও থ্যাতা ইঁদুরের মত শুয়ে শুয়ে শুনছে আর পাগল হয়ে যাচ্ছে ফোন ধরার জন্য।

মন্টু নিদারুণ কষ্টে হাউ মাউ করে কান্না শুরু করে। তখন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে সোলায়মানের গলা। তরুণ ছেলেটাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সোলায়মান বলে, কান্দিস না। কাইন্দা কিছু হইব? খামাখা কষ্ট বাড়ব।

কি করুম? কি করনের আছে?

আল্লা আল্লা কর্। আল্লা চাইলে বাঁচবি।

অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ঘুটঘুটে কালোর চেয়েও ঘুটঘুটে কালো এই অন্ধকার। কবরের অন্ধকার। বিশাল এই কবরে শুয়ে আল্লাকে ডাকছে আড়াইশো আদম সন্তান। আল্লার সৃষ্টি। আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা জীব। কবরের বাইরে যে দুনিয়া, সেখানকার আশরাফুল মাখলুকাতেরা তখন তমুল বিতর্কে মশগুল। কেন এই দুর্ঘটনা ঘটল? কার পাপে? ভাই ভাই গার্মেন্টস-এর দুই মালিক চৌধুরী শাফকাত খান এবং বরকত খান কেমন লোক? শোনা যায় চৌধুরীদের জন্মদাতা পিতা সরকারি দলের প্রভাবশালী মন্ত্রী হওয়ায় ভাই ভাই-এর যৌথ প্রচেষ্টায় জনৈকা সুফিয়া খাতুনের পুরনো বাড়িটাকে দখল করে সেটাকে ভেঙেচুরে ভাই ভাই গার্মেন্টস দাঁড় করিয়েছে। এ নিয়ে বেশ হৈ চৈ হয়েছিল কয়েকটা পত্রিকায়। দু'দিন পর সেই পত্রিকাগুলো থেকেই জানা গেল, সাড়ে পাঁচ কাঠা জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটা নাকি পরিত্যক্ত সম্পত্তি, সরকারের কাছ থেকে নিয়ামনুযায়ী লিজ নিয়ে ভাই ভাই গার্মেন্টস তৈরির পরিকল্পনা করেছেন দুই ভাই। উন্নয়নের জোয়ারে ভাসা দেশের অর্থনীতিতে আরো বেগ সঞ্চারের মহৎ উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছেন ভাই শাফকাত ও ভাই বরকাত।

সুফিয়া খাতুন সাংবাদিক সম্মেলন করে সবাইকে জানাল, পাকিস্তান আমলে তার বাবা কত কষ্ট করে বাড়িটা তৈরি করেছিলন। এই বাড়িতে ছেলে-পুলে-নাতি-পুতি নিয়ে গড়ে তোলা তার জমজমাট সংসার, বাড়ির গা ঘেঁষে একটা পেয়ারা গাছ, তিনটে মেহেদি গাছ... সব কিছুর জন্য তিনি কাঁদতে থাকেন। চোখের পানিতে ভিজে যাওয়া গালসমেত সুফিয়া খাতুনের বয়সী মুখখানার ফটো তুলতে দেখা গেছে কয়েকজনকে, কিন্তু পরদিন কোন পত্রিকায় খবরটি আসেনি। বরং জানা গেছে, কোন ফটোগ্রাফার নাকি জাপানি এক এক্সিবিশনে ছবিটা পাঠিয়ে পুরস্কার জোগাড় করেছে। ছবির নাম ক্রাইং বিউটি।

লোকজন কেউ কেউ নিচু স্বরে বলছে, সুফিয়া খাতুনের দীর্ঘশ্বাস সইতে পারেনি ভাই ভাই গার্মেন্টস। ভেঙে পড়েছে। যেমন চার বছর আগে ভেঙেচুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল সুফিয়া খাতুনের বাড়িটা।

পাশ থেকে আরেকজন প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, দীর্ঘশ্বাসে গার্মেন্টস ভাঙল ভাল কথা। এ্যাত্তগুলো নিরাপরাধ মানুষ মরল কেন? ওরা কি দোষ করেছে? চৌধুরী শরাফত আর চৌধরী বরকতের কি হবে? কিচ্ছু না। বরং বীমার টাকা পেয়ে বগল বাজাতে বাজাতে আবার দেশের অর্থনীতিতে যুৎসই অবদান রাখতে সোচ্চার হবে। ভাই ভাই গার্মেন্টস-এর উদ্বোধনীর দিনে স্বয়ং অর্থমন্ত্রীই তো এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। আবার যদি তিনি নতুন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন, তাহলে আবারও যে একইরকম আশার কথা শোনাবেন, সেটা নিশ্চিত। তিনি না এলে অন্যজন আসবেন। এই অন্যজন কিন্তু অন্য কথা বলবেন না। আশাবাদী কথা বলার সুযোগ পেলে কে ছাড়ে? আফটার অল, দে আর অল পজিটিভ থিংকারস। দে হ্যাভ ভেরি পজিটিভ এ্যাটিচ্যুড।

পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে কমলার প্রেগনেন্সি টেস্টের। গতকাল টেস্টের রিপোর্টটা নিয়ে ম্যানেজারের রুমে ঢোকার পাঁয়তারা করেছে বহুবার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতবার গেছে, শুনেছে মিটিং হচ্ছে, মিটিং। পিএ-কে বার বার বলেছে, ভেতরে গিয়ে স্যারকে ওর নামটা শুধু জানাতে। আগে তো ওর চেহারা দেখলেই পিএ হারামজাদাটা দাঁড়িয়ে যেত, তাজিমের সঙ্গে ম্যানেজারের রুমের দরজা খুলে ওকে ভেতরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিত। দিন পনের হারামজাদাটা কিছুতেই ওকে ভেতরে যেতে দিচ্ছে না। গেলেই বলবে, স্যার তো মিটিং-এ। গত রাতে শিফট শেষ হওয়ার পরও ও বাড়ি যেতে পারেনি। জেদ চেপেছিল খুব। মিটিং কি সারারাত হবে? যখনি বেরোবে, তখনি পিছু নেবে।

ম্যানেজার ওকে চিনতেই পারেননি। ব্লেজারের বোতাম লাগাতে লাগাতে পিএ-কে ধমকান, লেবাররা কীভাবে ভিড় করে এখানে? পিএ ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে স্যারের চলার পথ পরিষ্কার করে। ম্যানেজারের মোবাইলে তখন কল এসেছে। তিনি কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন... ছেলেপক্ষ আমার বুবলি সোনাকে পছন্দ করেছে? মাশাল্লা মাশাল্লা। সবই আল্লা পাকের রহমত।... ডেট যখন কনফার্ম তখন লিস্ট কমপ্লিট করে ফেল।... না না, কেনাকাটা সব সিঙ্গাপুর থেকে হবে। দূর... দূর... ইন্ডিয়ায় যাব, মেয়ে আমার ফকিরনি নাকি?

কমলার কানে যাচ্ছে না কোন কিছু। মিনিট বিশেক ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল টয়লেটের দেয়াল ধরে। ওর চারপাশে তখন ম্যানেজারের দু'হাত দেবী দুর্গার দশ হাতে পরিণত হয়েছে। দেবী দুর্গা হয়ে ওকে বানিয়েছে দ্রৌপদী, টেনে টেনে ওর শাড়ি খুলছে আর গদগদ স্বরে বলছে, কমলারানী তো জিনিস একখান। একেবারে কমলার কোয়ার মতো টসটসে। এক হাত ওর মুখ ছোয়, এক হাত কোমরে, এক হাত বুকে, এক হাত নিতম্বে, এক হাত ওর চুলে বিলি কাটছে....শ্রীমতী কমলারানীকে দেখে ম্যানেজারের নিরামিষ জীবনে নাকি বছরদশেক পরে জোয়ার এসেছে। এই জোয়ার দেখে সে পুলকিত, কমলারানী শংকিত। সেই শংকা দেখে ম্যানেজার আল্লা-খোদার কসম কেটে বলেছে, দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য সে কতখানি দেওয়ানা। কমলারানী নিজেও চরম মুহূর্তে শিৎকারের সঙ্গে তার ভগবানকে ডেকেছে পরম ভক্তিভরে। সেই কমলারানী টয়লেটের দেয়াল ধসে পড়ায় নিজেও ধসেছে। মাথাটা থেতলে গেছে, ঘিলু থেকে ছড়িয়ে পড়া রক্তের ধারা বালি-সিমেন্ট ভিজিয়ে কোন ফাঁকে যে প্রেগনেন্সি টেস্টের রিপোর্টটাও ভিজিয়ে দিয়েছে, কে জানে!

টিভি পর্দায় ম্যানেজারের চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। স্যুট-টাই-ব্লেজারের সঙ্গে মেহেদি মাখানো চাপদাড়ি আর সাদা সফের টুপি। ভাই ভাই গার্মেন্টেস-এর পক্ষ থেকে তিনি সবাইকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন। কারোর চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে, ভয়ের কিছু নেই। আল্লা আমাদের সাথে আছেন।

চ্যানেল বাংলাদেশ-এর তরুণী রিপোর্টার রিনা সালেক প্রশ্ন করেন, দুর্ঘটনা ঘটার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

রীনা সালেকের গোলগাল মুখটায় তেঁড়ামির ছাপ স্পষ্ট। সেদিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে ম্যানেজার উষ্মার সঙ্গে বলেন, টাইটনিকও তো নিয়ম মেনে অনুমতি নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। কেউ ভেবেছিল, টাইটনিক ডুববে? আল্লা ডুবাইতে চাইলে আপনি আমি কি করতে পারি? রীনা এরপরও প্রশ্ন করে, তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন, এতগুলো মানুষ মরে গেল স্রেফ আল্লার ইচ্ছে হয়েছিল বলেই? কারোর কিছু করার ছিল না? এখনো কিছু করার নেই?

কোন কারণ তো নাই। সব নিয়ম মেনেই অত্যন্ত দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সবচেয়ে খাঁটি মাল দিয়ে বিল্ডিংটা তৈরি করা হয়েছিল। কেন যে এমন হল, তা আল্লাপাক ভাল বলতে পারবেন। তাঁর হুকুম ছাড়া তো গাছের পাতাও নড়ে না।

রীনা সালেক নাছোড়বান্দার মত আবারো জানতে চায়, বিল্ডিংটা তৈরির সময় রাজউকের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি? শোনা যাচ্ছে, স্ট্র্যাকচারাল ডিজাইন অনুযায়ী পুরো বিল্ডিংটা তৈরি করা হয়নি?

রীনা সালেকের গোলগাল মুখটায় তেঁড়ামির ছাপ স্পষ্ট। সেদিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে ম্যানেজার উষ্মার সঙ্গে বলেন, টাইটনিকও তো নিয়ম মেনে অনুমতি নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। কেউ ভেবেছিল, টাইটনিক ডুববে? আল্লা ডুবাইতে চাইলে আপনি আমি কি করতে পারি? রীনা এরপরও প্রশ্ন করে, তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন, এতগুলো মানুষ মরে গেল স্রেফ আল্লার ইচ্ছে হয়েছিল বলেই? কারোর কিছু করার ছিল না? এখনো কিছু করার নেই?

মর্ জ্বালা! আল্লার ইচ্ছা ছাড়া মানুষ মরতে পারে? মারে আল্লা রাখে কে!

রীনা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ফিরে তাকিয়েছে ক্যামেরার দিকে। দুর্ঘটনার কারণ ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাবিষয়ক জোরালো রিপোর্টিং করা শুরু করে। পেছন দিকে ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে দাঁড়ানো ম্যানেজার তখন আল্লার হুকুমবিষয়ক দু'টি হাদিস বলছেন চৌধুরী শাফকাত খানের পার্সোনাল অফিসার মোজাম্মেলকে। হাদিস শুনে মোজাম্মেলও বলে, সবই আল্লার ইচ্ছা। মারে আল্লা রাখে কে!

ম্যানেজার মোজাম্মেলকে হাত ধরে সরিয়ে নিতে নিতে নিচু গলায় বলেন, স্যারেরা ভাল আছেন তো?

মোজাম্মেল ফিসফিস করে বলেন, আছেন। প্রাইম মিনিস্টারের অফিস থেকে ফোন করে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। মন্ত্রীমহোদয় প্রাইম মিনিস্টারকে বলেছেন, ছেলেদের কিছু হলে রেজিগনেশন লেটার রেডি থাকবে। তার মানে বুঝছেন তো, একটা সিট নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আর ঐ এলাকায় তারা ছাড়া আর কোন বাপের ব্যাটা আছে, এমপি ইলেকশনে স্যারের আব্বাকে ডিফিট দেয়? দল নিশ্চয় চাইবে না সিটটা হাতছাড়া হোক। শ'দুয়েক কুলি-কামিন-লেবার মরে গেল বলে এরকম বোকামি করবেন প্রাইম মিনিস্টার? কভি নেহি।

রিপোর্টার শালা-শালিরা বড় বকছে। পত্রিকার পাতায় পাতায় মরা মানুষের ছবি। মানুষ পড়ছেও মজা করে। আর টিভি খুলে বসে আছে হা করে, মরা মানুষের ভাঙাচোরা শরীর না দেখলে ভাল্লাগছে না যেন। যত্তোসব!

আহা, ওদেরও তো কিছু করে খেতে হবে।

তা ঠিক।

মোজাম্মেল ম্যানেজারের সঙ্গে অতঃপর আরো কিছু নিবিড় আলোচনায় মত্ত হয়। বাতাসে লাশ পচা দুর্গন্ধ। আতর মাখা রুমাল নাকে দিয়ে দাঁড়ানো ম্যানেজার পকেট থেকে আতরের শিশি বের করে মোজাম্মেলের রুমালে কয়েক ফোঁটা ছিটিয়ে দেয়। নাকে সুগন্ধী রুমাল চেপে হাসে মোজাম্মেল, নিজেকে কেমন বর বর লাগছে।

বর বর! হা হা হা! বরবর... মানে বর্বর নয় তো? হা হা হা।

ম্যানেজারের সেন্স অফ হিউমার হাদিয়ে তোলে মোজাম্মেলকেও। হা হা হা।

চাপা পড়া ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়ানো উদ্ধারকর্মীরাও জীবনের নানান কথা ভেবে কখনো কখনো ফুচকি কিংবা মিচকি হাসি হেসে উঠছে। টিভি থেকে ভেসে আসছে হাসির নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যবহৃত হা হা হাসির শব্দ। রেডিওতে বাজছে গান। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে!

চাপা পড়া ধ্বংসস্তূপের নিচের জগতটা তখন কান্না আর কোঁকানিতে ভরা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ওরা কেঁদে ওঠে। একটু থামে, তারপর আবার কাঁদে। যখন থামে, তখন আরো কেউ কেঁদে উঠল কি না, সে শব্দ শুনতে চায়। অতল অন্ধকারের শরীর ফুঁড়ে এদিক ওদিক থেকে ভেসে আসছে কান্না।

সোলায়মান কাঁদছে, মউতের ফেরেস্তা আসে না ক্যান্?

মন্টু কাঁদছে, সওয়াল-জবাবের ফেরেস্তা আসনের এ্যাত দেরি হইতেছে ক্যান্?

জোহরা কাঁদছে, মউতের ফেরেস্তা কখন আইব?

হালিমা কাঁদছে, আর তো দেরি সহ্য হয় না।

যারা মরে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে সওয়াল-জবাবে ব্যস্ত থাকা ফেরেস্তা হাই ছাড়েন। কেউ চাইলেই তো হল না, আল্লা হুকুম না দিলে তিনি তো কারো সওয়াল-জবাব করতে পারেন না।

ধ্বংসস্তূপের অন্ধকারে কাল কেউটের মত চুপচাপ শুয়ে মউতের ফেরেস্তা অপেক্ষায় আছেন। আল্লার হুকুম হলেই আরো কিছু জান কবজ করতে হবে। যতক্ষণ হুকুম হবে না, ততক্ষণ এদের শরীরিক কষ্ট সহ্য করতেই থাকবে।

মানুষগুলো আল্লাকে ডাকছে। ও আল্লা, তুমি শুধু আমাদের মারো, আর ওদেরকে রাখো। তুমি এরকম ইচ্ছা কর কেন, জবাব দাও। নিজে না পার, মউতের ফেরেস্তারে বল এসে জবাব দিতে। যেমন করে এক ফেরেস্তা হেরা গুহায় গিয়ে বলেছিল, ইক্‌রা। সওয়াল-জবাবের ফেরেস্তারে বল, সে এসে বলে যাক্। যেমন করে সে সওয়াল জানতে চায়, তেমনি করে জবাব দিক্ এই প্রশ্নের। তুমি কেন শুধু আমাদেরকেই মারো? আমাদের সন্তানদের না খাইয়ে মারো। আমাদের স্ত্রীদের বেশ্যা বানিয়ে মারো। আমাদের মা-বাবা-ভাই-বোনদের অপঘাতে মারো। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে সারা পৃথিবীজুড়ে তুমি শুধু আমাদেরকেই মারো। বুশ-ব্লেয়ার-চৌধুরী-খান-মন্ত্রী-মিনিস্টার-বড়লোক-আমলাদের তুমি মারো না। কেন? এরা কি তোমার দলের লোক? আমরা কি বিরোধী পার্টি করি? হে আল্লা, রাব্বুল আলামীন, তুমিও কি পলিটিক্স কর?

মউতের ফেরেস্তা আর সওয়াল-জবাবের ফেরেস্তাও আল্লাকে ডাকছেন। এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আল্লা যেন আবার তাদেরকে নির্বাচন না করেন। কাজের চাপে এমনিতেই দম ফেলার ফুরসত নেই। কত কত ফেরেস্তা আছেন, তাদের ভেতর থেকে অন্যদেরকে পাঠানো হোক। প্রয়োজনে আলাদা অধিদপ্তর খোলা হোক, সেখানকার ফেরেস্তারা শুধুমাত্র এসব প্রশ্নের জবাব দিতেই ব্যস্ত থাকবেন।

নাসরীন মুস্তাফা
ছোটগল্পকার

অনুবাদ গল্প

ছেঁড়া জুতো

জ্ঞানী গুরমুখ সিং মুসাফির

জুতোজোড়া ছেঁড়াই আছে। বৈরাঙ যেখানেই যায় লোকজন তার জুতোজোড়ার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার পরিচিতজনেরা তো তার জুতোজোড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে দ্বিধা করে না। এমন কী আগন্তুকেরাও তার জুতোর খোঁজ নেয়। তার এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করেই বসে, 'বৈরাঙ এই জুতো তুমি কখন কোথা থেকে পেয়েছিলে, দামই-বা কত পড়েছিল?'

প্রায় প্রত্যেক সময়ই কেউ না কেউ তার জুতো সম্বন্ধে জানতে চায়। জুতো সম্বন্ধে জানতে চাইলে সে আনন্দ পায়। জুতোজোড়া সে কখনোই পা থেকে খোলে না। জুতোজোড়া পরে থাকলে তাকে খুশি খুশি লাগে। কেউ তার জুতোজোড়া সম্পর্কে অবজ্ঞা করলে সে মনে মনে অখুশি হয়। কয়েকটা জিনিস তার জীবনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জুতোজোড়া তার একটি।

সে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল তার পায়ে জুতো নেই। তার মন কত না স্মৃতিতে ভরা! তার মনটা দূর-দুরান্তে চলে যায়। স্মৃতি সততই সুখের। স্মৃতি দেশ-দেশান্তরে ধাবমান। কোন দেশের সীমারেখা স্মৃতিকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে বাধা দিতে পারে না। স্মৃতির দেশ-দেশান্তরে যেতে পাসপোর্ট-ভিসার প্রয়োজন হয় না। বৈরাঙের এখন মনে পড়ছে জুতোজোড়া একটা কুঁড়েঘরের কোনায় বসে তৈরি করা হয়েছিল। এখনো ছবির মত বৈরাঙের চোখে সেই দৃশ্য ভাসছে।

সে সারাজীবনে একজনের হাতের তৈরিই জুতো পরে আসছে। আগে সে একজোড়া জুতো কয়েকদিন ব্যবহারের পর চাকর-বাকরদের দিয়ে দিত। তারপর আবার নিজের জন্যে আরেকজোড়া তৈরি করে নিত। জুতো তৈরির জন্য বৈরাঙকে কতবার যে চর্মকারদের মহল্লায় যেতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তার অনেক বন্ধু-বান্ধব তাকে দিয়ে ওখান থেকে জুতো তৈরি করে আনিয়েছে। তার কোন বন্ধু হয়তো তাকে বলল, 'আমার জুতোর সাইজ ঠিক তোমার জুতোর সাইজের। তুমি অবশ্যই তোমার প্রিয় চর্মকারকে দিয়ে আমার একজোড়া জুতো তৈরি করিয়ে দেবে।'

বৈরাঙ জুতো তৈরি করানোর জন্য চর্মকারের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলত, 'সালাম, সেরাজ চাচা। খোশ আমদেদ।' সেরাজ কাজ করতে করতে সালামের জবাব দিয়ে তার মেয়ে নুরুকে বৈরাঙের জন্য একখানা পিঁড়ি আনতে বলত। নুরু তাকে একটা পিঁড়ি এনে দিয়ে তার পাশে বসে হাত এগিয়ে দিয়ে তার পায়ের মাপ বোঝার চেষ্টা করত। মেয়ের কাণ্ড দেখে সেরাজ বলে উঠত, 'অত সহজে তার পায়ের মাপ নেওয়া যাবে না। আমি তার পা দু'খানা ভালভাবে চিনি। আমি চোখ বন্ধ করে জুতো তৈরি করে দিলেও ঠিক ঠিক তার পায়ে ফিট হবে।'

চর্মকারের মাটির ঘরে বসে সে তাদের সঙ্গে কত খোশগল্প করেছে তার ইয়ত্তা নেই। বৈরাঙের বর্তমান জুতোজোড়ার মধুময় স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে তার মনের পর্দায় ভেসে ভেসে ওঠে। শেষ জুতোজোড়া ছিঁড়ে গেলে বৈরাঙ দীর্ঘদিন সেটা স্লিপার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। একসময় জুতোজোড়ার এমন দশা হল পায়ে দিলে একপাশ থেকে রাজ্যের ধুলো পায়ে লেগে পা নোংরা হয়ে যেত।

তবু বাইরে গেলে বৈরাঙ ওই জুতোজোড়া পরেই যেত। তার ভাবি তাকে বলত, 'ছেঁড়া জুতোজোড়া তুমি এখনো ছাড়তে পারলে না?' ছেঁড়া জুতোজোড়া পায়ে থাকায় ভাবি প্রায়ই তাকে হাসিঠাট্টা আর তামাশা করে বলত, 'ছেঁড়া জুতোজোড়া তোমার পায়ের বারোটা বাজিয়ে দেবে।' ভাবির কথা শুনে বৈরাঙ বিখ্যাত উর্দু কবি হালির শের আওড়ে বলত, 'বন্ধুর স্মৃতিই আমার সঙ্গী হোক, হে ঈশ্বর, আমার ক্ষত কখনোই শুকোবার নয়।'

বৈরাঙের ভাবি প্রায়শই তার বিয়ের কথা তোলে। ভাবি তার দেখা বিবাহযোগ্যা মেয়েদের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চেহারার বর্ণনা একে একে বৈরাঙের কাছে দিতে থাকে। ভাবির কথা শুনে বৈরাঙ বলে, 'তুমি তেমন লেখাপড়া না জানলেও দেখছি একজন ভাল চিত্রকর। তোমার হাতে একটা তুলি দিলে অমৃতা শেরগিলও তোমার কাছে হার মানবে।' ভাবির মুখ থেকে মেয়েদের চেহারার বর্ণনা শুনে বৈরাঙ মুগ্ধ হয়ে যায়। তখনই শোনে ভাবি বলছে, 'তুমি যদি আর কিছুদিন অবিবাহিত থাক তবে কেউ তোমাকে পাত্তাই দেবে না।' ভাবির কথার জবাবে বৈরাঙ বলে, 'বিয়েই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তোমরা আমার বিয়ে নিয়ে একটু বেশিই ভাবনা কর।' তারপর সে গড় গড় করে দেশের অবিবাহিত লোকদের নাম আউড়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের চিফ মিনিস্টার ডা. বি সি রায়, ইউপির চিফ মিনিস্টার সি বি গুপ্তা, তামিলনাড়ুর চিফ মিনিস্টার মি. কামরাজ, ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মি. কৃষ্ণ মেনন প্রমুখের নাম বলে সে জোরের সঙ্গে বলে 'এঁরা কি এতই ফেলনা যে তারা চাইলে তাদের গলায় মালা দিতে মেয়েরা এগিয়ে আসবে না?' তারপর সে পাঞ্জাবের অবিবাহিত সমাজসেবকদের নাম বলতে আরম্ভ করে। তারপর ভাবিকে জিজ্ঞেস করে, 'এঁরা কি হৃদয় নিঙড়িয়ে দেশের সেবা করেননি?'

ভাবি হেসে বলে, 'আমি তোমার বাজে কথা শুনতে চাইনে। আগামীকাল তোমার ছেঁড়াজুতো আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব। তুমি ওই ছেঁড়াজুতো পরে যেখানেই যাও সেখানেই নোংরা করে আস।' বৈরাঙ সে-কথার প্রতিবাদ করে বলে, 'ছেঁড়া জুতোওয়ালাকে কি কেউ বিয়ে করতে চায় না?' বৈরাঙ তার ভাবির সঙ্গে মশকরা করে। সে ভাবির চোখের ভাষা বোঝে। এখন সে ভাবির মুখের ভাষা অনুধাবনের চেষ্টা করে। ভাবিও তার দেবরের মনটাকে এক লহমায় বুঝে ফেলে।

একদিন সন্ধ্যায় ভাবি সত্যি সত্যি বৈরাঙের ছেঁড়া জুতোজোড়া আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তার পরের দিনই ছেঁড়া জুতোজোড়াকে আবার ড্রয়িংরুমে দেখতে পেয়ে ভাবি সত্যিই সত্যিই অবাক হয়।

'ভাবি, তুমি কি বিশ্বাস কর কোন কিছু পুরনো হয়ে গেলে তা ফেলে দিয়ে সে জায়গায় নতুন আরেকটাকে বসাতে হয়?' বৈরাঙ তার ভাবিকে জিজ্ঞাসা করে। 'বুঝতে পেরেছি তুমি কী বলতে চাচ্ছ। কিন্তু তুমি সারাজীবন পুরনো জিনিস ব্যবহার করতে থাকলে কীভাবে নতুন জিনিস ব্যবহার করতে শিখবে?' বৈরাঙ ভাবির প্রশ্নের কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। ভাবিকে সে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার জন্য বলে, 'আমি শেষবার পাকিস্তানে গিয়ে কিন্তু লাহোর থেকে এই জুতোজোড়া আনিনি। এই জুতোজোড়া আনার ব্যাপারে একটা কাহিনি আছে। আর সেটা করেছ তুমিই। প্রায় প্রতি বছরই তুমি জোড়মেলার তীর্থানুষ্ঠানে যাও। সেবার তুমি লাহোরে গিয়ে চর্মকার সেরাজের ওখানে গিয়েছিলে। সেরাজই জুতোজোড়া আমাকে দেবার জন্যে তোমাকে দিয়েছিল।' বৈরাঙের কথা শেষ হলে ভাবি তাকে জিজ্ঞেস করে, 'এতে আমার দোষটা কী ছিল?'

'না, তাতে তোমার কোন দোষ ছিল না।'

'সেরাজ আমাকে বলল, 'নুরুর বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। নুরু নিজের হাতে জুতোজোড়া বৈরাঙের জন্যে বানিয়েছিল। তীর্থযাত্রীদের কারো কাছে জুতোজোড়া পাঠিয়ে দেবার কথা সে বলে গেছে।' তা ভাই বৈরাঙ নুরুর কথা শুনে তোমার মুখটা রাঙা হয়ে উঠল কেন?" বৈরাঙের ভাবি একটুখানি থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'সে-সময় নুরুর তৈরি জুতো তোমাকে পাঠানোয় আমি তেমন কিছু মনে করিনি। কিন্তু এখন দেখছি তোমার জন্য সে-সময় শুধু জুতোই আনিনি, একজনের ভালবাসাও সঙ্গে করে এনেছিলাম।'

বৈরাঙ বলল, 'তুমি কিন্তু ভাবি একটা সামান্য ব্যাপারকে রঙ চড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তুলছ।'

"তুমি কি মনে কর এর মধ্যে কোন গোপন ব্যাপার-স্যাপার আছে? তুমি মুসলমানের বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করায় গ্রামের লোকজন বেজায় খাপ্পা হয়ে তোমার ভাইয়ের কাছে নালিশ জানিয়েছিল। তাদের এক কথা, আগে তো এমনটা কখনো ঘটেনি। তারা তোমাকে খাওয়ানোর কথা সেরাজকেও জিজ্ঞেস করেছিল। সে প্রথমে স্বীকার করেনি। পরে সেরাজ বলেছিল, 'হ্যাঁ, নুরু বৈরাঙের জন্যে দুধ-রুটির ব্যবস্থা করেছিল। হিন্দুদের কাছে মুসলমানদের হাতের পানি দুষিত কিন্তু দুধ তো নয়!' আমার যতদূর মনে পড়ে, তুমি সে-সময় ওদের ওখানে খাবার কথা আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলে। ভাবির কথা শুনে বৈরাঙের মুখে কথা যোগায় না। সে-সব দিনের পুরনো স্মৃতি তার মন থেকে হারিয়ে গেছে। ভাবি বলতে শুরু করে, 'হঠাৎ সেরাজ বলতে আরম্ভ করে ওটাই ছিল বৈরাঙের জন্যে নুরুর শেষ উপহার। সে নিজেও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। নুরুরও বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আর কেউ হিন্দু-মুসলমানের একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়াকে খারাপ চোখে দেখে না।" বৈরাঙ তার ভাবির কথার সূত্র ধরে বলল, 'হ্যাঁ, এখন আমিও বিশ্বাস করি, আমরা আগেকার দিনের কুসংস্কারগুলোকে পেছনে ফেলে আসতে সক্ষম হয়েছি। তার জন্যে আমাদের কি কম মূল্য দিতে হয়েছে, ভাবি?'

'আমরা খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার পেছনে ফেলে আসতে পেরেছি বটে। কিন্তু এখনো আমরা এক হৃদয়হীন নিষেধের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রয়েছি। সীমান্ত, পাসপোর্ট, ভিসা আরো কত কী! একজন মানুষ স্বাধীনভাবে তার জন্মভূমিতেও যেতে পারবে না। আমি এবার কেমন করে পাঞ্জাসাহিব তীর্থে যাব?' ভাবির কথায় বিষাদের সুর।

ভাবির কথায় বৈরাঙের মনে পুরনো দিনের স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠতে থাকে। সে ভাবে, এটাই সুযোগ ভাবিকে নিয়ে নিজের জন্মভূমিতে যাবার। সে ভাবির ইচ্ছে পূরণের জন্যে পাঞ্জাসাহিব যাবার সব আয়োজন করে ফেলে। বৈশাখী মেলার আগের দিন তারা রাওয়ালপিণ্ডি রেলস্টেশনে পৌঁছয়। সেরাজ ও নুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তারা আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়ে। নুরুর কোলে একটা দুধের শিশু। বৈরাঙ বাচ্চাটিকে নিয়ে আদর করতে থাকে।

সেরাজ তাক থেকে একজোড়া জুতো পেড়ে বৈরাঙের হাতে দিয়ে বলে, 'নুরু বিয়ের আগে তোমার জন্যে এই জুতোজোড়া তৈরি করেছিল।'

নুরুর মা যখন মারা যায়, সে তখন ছোট্ট শিশু। সেই নুরু দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে। বৈরাঙ নুরুদের বাড়িতে গেলে সে তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠত। নুরু শুধুমাত্র একবারই দুধ-রুটি খাইয়ে বৈরাঙকে আপ্যায়ন করেছিল। একবারের বেশি আপ্যায়ন করার তার সাহস হয়নি। বৈরাঙের গ্রামের লোকেরা হুজ্জতি শুরু করতে পারে ভেবে সে বৈরাঙকে আপ্যায়ন করতে চায়নি। বৈরাঙ একবার সেরাজ চাচার বাড়িতে গিয়ে নুরুকে একা পেয়েছিল। নুরু দরজা খোলেনি। ভেতর থেকেই সে চিৎকার করে বলেছিল, 'আব্বা বাড়ি থাকলে তুমি আবার এস বৈরাঙ। তখন তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

তারা সবাই একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল– বৈরাঙ, নুরু, সেরাজ আর ভাবি। তারা একসঙ্গে পাঞ্জাসাহিব গুরুদ্বারেও গিয়েছিল।

ঈশ্বর জানেন ভাবি তার দেবরকে বিয়ে দিতে পেরেছে কিনা। নতুন জুতো পাবার কারণে বৈরাঙকে ছেঁড়া জুতো না পরতে হওয়ায় ভাবির কাছ থেকে আর কোন কথা শুনতে হয়নি।

অনুবাদ **মনোজিৎকুমার দাস**

লেখক পরিচিতি

জ্ঞানী গুরমুখ সিং মুসাফির (১৮৯৯–১৯৭৬) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী লেখক ও রাজনীতিবিদ। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তিনি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর কবিতা ও ছোটগল্পে সৃজনশীলতা প্রতিভাত। দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার পাঞ্জাবের উভয় সীমান্তের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে মর্মাহত হয়ে তিনি অনেক গল্পে দেশভাগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তোলেন।

তাঁর ছোটগল্পের নির্বাচিত সংকলন Urwar paar-এর জন্য তিনি ন্যাশনাল একাডেমি অফ লেটার পুরস্কার লাভ করেন। পাঞ্জাবি ভাষায় লেখা তাঁর গল্পের কে এস দুগ্‌গাল-এর ইংরেজি ভাষান্তর The Broken Shoes-কে 'ছেঁড়া জুতো' শিরোনামে বঙ্গানুবাদ করা হল। দেশভাগের ফলে ভিন্ন ধর্মের দুই নারী-পুরুষের অব্যক্ত ভালবাসার কাহিনি এ গল্পে সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে।

তর্পণ

ধারাবাহিক উপন্যাস

ঋতা বসু

• পূর্ব প্রকাশিত-র পর

ভালুকপং, ১৭ অক্টোবর

আমি ঠিক করেছি শতদল নিজে থেকে না বললে আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করব না। কাল রাত পোহালেই সব যে যার গন্তব্যে রওনা দেবে। এখনও পর্যন্ত আমরা অন্ধাকার হাতড়ে চলেছি। শতদল আমার অবস্থা আন্দাজ করে হালকা চালে বলল– চল এইবার আলস্য ত্যাগ করে একটু কাজকর্ম শুরু করি।

– কি কাজ করবে শেষবেলায়?

– যার সঙ্গে একদমই কথা বলিনি তার কাছে বিদায় বেলায় একবার অন্তত যাওয়া উচিত।

অর্পণা পরদিনের যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে বাক্স খুলে গোছাতে বসেছিলেন। আমাদের দেখে অবাক হলেও সেটা প্রকাশ না করে চিলতে হেসে বললেন– এই কাজ একটু এগিয়ে রাখছি। কাল শুনলাম খুব সকালেই যাত্রা।

শতদলই আগে কথা বলল– আপনাকে একটু বিরক্ত করব। কয়েকটা কথা আমাদের জানার আছে।

ঋতা বসু। জন্ম কলকাতায়। আদি বাড়ি কুমিল্লা। পড়াশোনা শান্তিনিকেতন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। প্রিয় বিষয় রহস্য ও ইতিহাস। ছোঁদের গল্প ও ছোঁগল্প লিখে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ। ক্রমশ উপন্যাসেও সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর সৃষ্ট পিন্টুমামা ও বাঘা এই চরিত্র দুটি তাদের রহস্যময় ও মজাদার কর্মকাণ্ডের জন্য পাঠকসমাজে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত গোয়েন্দা শতদল একেবারে চারপাশে ঘটে চলা অপরাধ ও অপরাধীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে পাঠককে আবিষ্ট রাখেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। গল্প উপন্যাস ও রম্যরচনা নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত। ছোঁ-বড় যে-কোন ভ্রমণেই সমান উৎসাহী। চিন জাপানের প্রাচীন ক্যালকুলেশন পদ্ধতি শিখেছেন আগ্রহের সঙ্গে। লেখালেখির সঙ্গে শিশুশিক্ষা ও টিচার্স ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন বহু বছর ধরে। ছোঁদের এবং বড়দের দু'ধরনের লেখাতেই সমান স্বচ্ছন্দ।

আমরা ঘরে ঢুকবার পর শতদলের ইশারায় প্রবীর দরজা বন্ধ করে। অপর্ণা এবার দৃশ্যতই অবাক, একটু বোধ হয় সন্ত্রস্তও। প্রবীর বলল– ভয় পাবেন না। আমি কলকাতা পুলিশের লোক। আর ইনি শতদল সান্যাল। আমাদের মাঝে মাঝে সাহায্য করেন। ইনি কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। প্লিজ একটু কোঅপরেট করবেন।

শতদল বলল– আপনার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু কথা আছে।

অপর্ণার কপালে সামান্য কুঞ্চন। বললেন– সে তো আপনারা সবই জানেন।

– আমরা জানি কিন্তু আপনি জানেন না। আপনার স্বামীর মৃত্যু এ্যাকসিডেন্ট নয় তাকে খুন করা হয়েছে।

– সে কি? কেন? এইটুকু বলতে না বলতেই অপর্ণার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল– কে করল এমন কাজ?

– সেইটা জানতেই আপনার কাছে আসা। আপনাদের বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আপনার স্বামী মলয় দত্তর কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল বলে জানেন?

– একেবারেই না। উনি আদ্যন্ত পারিবারিক। বউ-মেয়ের বাইরে আর কোন জগৎই নেই। চোখের জল মুছে বললেন অপর্ণা।

– আপনার জানার বাইরে? ক্লাব অফিস ওই জাতীয়–

– যা কিছু ঘটে খুঁটিনাটি সবই আমাকে বলেন। আমাকে না বললে ওর ভাত হজম হত না।

– হঠাৎ আপনারা অরুণাচল আসা ঠিক করলেন কেন?

অপর্ণার মুখে কি সামান্য ছায়া পড়ল, না বাইরে আলোটা হঠাৎ কমে গেল বুঝতে পারলাম না। স্বামী খুন হয়েছেন শুনে অপর্ণার আশ্চর্য হয়েছেন ঠিকই কিন্তু কে, কেন, কিভাবে স্বাভাবিক প্রশ্নগুলো যে প্রথমেই ছিটকে ওঠে যেন তা পাশ কাটিয়ে গেলেন। বিষয়টা নিয়ে ওর আগ্রহের অভাবে আমি একটু অবাকই হলাম। এর সঙ্গে অরিন্দম বাগচীর কি কোন যোগাযোগ আছে? শতদল নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা।

অপর্ণা প্রশ্নের উত্তরটা দিলেন খুব মৃদু গলায়– ওর খুব বন্ধু, বলতে পারেন প্রাণের বন্ধু ছিল, নেফার যুদ্ধে মারা যান। তার সত্তর বছর পূর্ণ হল এ বছর জুলাইতে। বন্ধুর শেষ ইচ্ছা অনুসারে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলাম বলতে পারেন।

– আচ্ছা? অপ্রত্যাশিত এই উত্তরে শতদল খুবই অবাক হয়ে গিয়েছে বোঝা যায়।

– খুব ইন্টারেস্টিং। তো হঠাৎ এই সত্তরেই কোন? আরও আগেই তো শ্রদ্ধা জানাতে পারতেন। পঞ্চাশে-ষাটে।

অপর্ণা স্পষ্টতই অপ্রস্তুত। কি যেন একটা বলতে গিয়েও বললেন না। শতদল বলল– আপনি প্লিজ গোপন করবেন না। যত সামান্যই মনে হোক না কেন বলুন।

অপর্ণা নিজেকে সামলে নিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি– না, গোপন করার মত কিছু নেই। আমার স্বামীর সুখ-সৌভাগ্যের পেছনে এই বন্ধুর অবদান অনেক। যেহেতু সেই সময়ে যুদ্ধের ডামাডোলে কর্নেল মুখার্জির বডি আনা হয়নি– শ্রাদ্ধ হয়নি ঠিক করে–

শতদল বাধা দিয়ে বলে– কেন ওঁর পরিবার তো ছিলই– মা-বাবা-স্ত্রী-সন্তান।

অপর্ণা বললেন– ওরা খুব আপসেট ছিলেন আর আমরাও নানা ঝামেলায় ওই দুঃসময়ে ওদের পাশে থাকতে পারিনি– এনি-ওয়ে আমাদের একজন খুব কাছের মানুষের কথা শুনেই উনি ঠিক করেছিলেন তাওয়াংয়ে আসবেন এবং বন্ধুর নামে এখানকার একটা অরফ্যানেজে টাকা দিয়ে যাবেন।

– কাছের মানুষটি কে? তার নাম কি? অপর্ণা গম্ভীর শক্ত গলায় বললেন– আমাদের বন্ধু। তার সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। উনি যাস্ট একটা সাজেশান দিয়েছিলেন।

শতদল আর চাপাচাপি না করে বলল– তাই বলুন। এখন মনে পড়েছে সেই জন্যই উনি বলেছিলেন গৌহাটি এয়ারপোর্টে 'আমাদের শুধু তাওয়াং আসারই কথা ছিল।' অরুণাচল বেড়াতে এলে কেউ তো শুধু তাওয়াং আসে না। আমার স্মৃতিশক্তি আজকাল বিট্রে করছে। শতদল বলল আমাদের উদ্দেশ্য করে। এবার অপর্ণার দিকে ফিরে আবার প্রশ্ন করল– আপনারা কি বরাবরই দিল্লির বাসিন্দা?

– না, আগে কলকাতায় ছিলাম। বিয়ের পর দিল্লি আসি।

– শেষ প্রশ্ন– আপনাদের মৃত বন্ধুর নাম?

– কর্নেল জয়দেব মুখার্জি। ওয়ার মেমোরিয়ালে আলাদা করে লেখা আছে দেখবেন। নেফার যুদ্ধে বীরত্বের জন্য মরণোত্তর পরমবীর চক্র পেয়েছেন।

– আর একটা কথা। এই দলের কারওকে কি আপনারা আগে থেকে চিনতেন? শায়ক অরিন্দম বেণুগোপাল?

– একেবারেই না।

– আপনি শিওর আপনার স্বামীও চিনতেন না? হয়তো এখানে এসে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

– অসম্ভব।

– অনেক ধন্যবাদ। আপনি খুবই সাহায্য করলেন। শতদল আচমকা কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ায়।

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর

পিয়ালী মোবাইল ফোনে চারটে মিসড্ কল দেখল বাথরুম থেকে বেরিয়ে। চারটেই এক নম্বর থেকে। পিয়ালী সাড়া দেবার কোন তাগিদ বোধ করল না। রনোর কাকীমা অসুস্থ। কাকা বার বার তাকে ফোন করছেন যাবার জন্য। কাল অফিসে এতবার ফোন করেছেন যে পিয়ালী বাধ্য হয়ে একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। প্রতিদিন সেটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া যে রোগের চিকিৎসা তার জানা নেই তার জন্য স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ নষ্ট করে দৌড়ে যাবার কোন টান সে অনুভব করছে না।

রনো নেই আজ আটদিন। নেই বলেই পিয়ালী যেন এই প্রথম অনুভব করল রনো আসলে কোনদিনই ছিল না। পিয়ালীর জন্যই টিকে ছিল এই সম্পর্ক। কেনই বা পরিণতিহীন এই সম্পর্ক সে গত তিনবছর ধরে টেনে চলেছে, কেনই বা মা-বাবাকে দুঃখ দিয়ে উল্টোস্রোতে সাঁতরে চলেছে, সে কি

পিয়ালীর এখন মনে হচ্ছে রনোকে সে কতটুকু জানে। ছুটির দিন পিয়ালীই বার বার গিয়েছে রনোর বাড়িতে। রনোর নির্জন ঘরে প্রবল ভালবাসাবাসির টানেই সে যেত। রনো তাকে ডেকেছে কিন্তু কোনদিন আসেনি তার অফিসে বা বাড়িতে। পিয়ালীও কোনদিন যায়নি রনোর কর্মক্ষেত্রে। খুব সন্তর্পণে রনো বেশি মাখামাখি এড়িয়ে যেত।

সবার থেকে কত আলাদা বেপরোয়া এটা প্রমাণ করবার জন্য?

অফিসের লম্বা করিডোর দিয়ে কালকের সেই লোকটা অলসভাবে হেঁটে গেল এদিক থেকে ওদিক– যেন সরকারি অফিসে আসা হাজার ভিড়ের একজন। পিয়ালীর চোখে চোখ রাখল কালকের সেই লোকটা। আচমকা পিয়ালীর মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে। কাল থেকে লোকটাকে যেন বারকয়েক দেখল সে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে এর সঙ্গে রনোর নিরুদ্দেশের কোন সম্পর্ক নেই তো? লোক গমগমে ব্যস্ত দুপুরের অফিসে যেন নির্জনতা ঘনিয়ে এল। পিয়ালীর এখন মনে হচ্ছে রনোকে সে কতটুকু জানে। ছুটির দিন পিয়ালীই বার বার গিয়েছে রনোর বাড়িতে। রনোর নির্জন ঘরে প্রবল ভালবাসাবাসির টানেই সে যেত। রনো তাকে ডেকেছে কিন্তু কোনদিন আসেনি তার অফিসে বা বাড়িতে। পিয়ালীও কোনদিন যায়নি রনোর কর্মক্ষেত্রে। খুব সন্তর্পণে রনো বেশি মাখামাখি এড়িয়ে যেত। সামাজিকতায় তার ঘোর আপত্তি। পিয়ালী শুনেছে রনো খুব ছোট বেলাতেই মা-বাবা হারিয়েছে। কাকীমা রনোর অসামাজিক স্বভাবের সাফাই গেয়ে বলেছেন মা-বাপ মরা তো সেই জন্যই ওরকম। একটু মানিয়ে নিস। পিয়ালী প্রথম প্রথম রনোকে অনেকবার বলবার চেষ্টা করেছে– এরকম অনেকেরই হয়। তুলনায় রনো ভাগ্যবান। ঠাকুমা কাকা কাকীমার খুবই আদরে মানুষ। কিন্তু রনোর স্পর্শকাতরতা দেখে এই প্রসঙ্গ আর বেশি এগোয়নি।

পিয়ালী যেন এক মুহূর্তে অত্যন্ত অস্পষ্ট আবছা এক মানুষের মুখোমুখি, যাকে সে এতদিন আপন ভেবেছে না চিনেই। এখন রনো নেই কিন্তু এই লোকটি কি তার কাছে কিছু চায়? সেও কি রনোকে খুঁজছে তার মত? না কি রনোর জীবনের কোন এক অন্ধকার অজানা দিকের সঙ্গী সে– পিয়ালীকেও টেনে নিয়ে যাবে গহন অতলস্পর্শ এক খাদের গভীরে। পিয়ালী রনোর মুখটা মনে করতে চাইল তার বদলে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল দাড়িওলা এক অচেনা মুখের ছবি। রনো যে কেন এত অদ্ভুত কে জানে। রনোর প্রতি আকর্ষণটাকে সে জোর করে ভীষণ বিতৃষ্ণায় পরিণত করতে চায় কিন্তু পেরে ওঠে না।

অফিসে মোবাইল ফোনটার আওয়াজ বন্ধ থাকে। হঠাৎ থর থর করে সেটা কেঁপে উঠতে পিয়ালী দেখে রনোদের বাড়ির নম্বর। বিবর্ণ পুরনো বাড়িটার সোঁদা গন্ধ মাখা হাওয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দেওয়ালের কথা মনে করে প্রবল বিরাগ নিয়ে চেয়ে থাকে সে মোবাইল ফোনটার দিকে। ফোনটা নিরুপায় থেমে যায় এক সময়ে। পিয়ালী যেন এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোনটা তুলে সুইচ অফ করে রেখে দেয় ব্যাগের মধ্যে। ফোনের কাঁপুনিটা এখন ছড়িয়ে গিয়েছে বুকের মধ্যে।

মুখ তুলে দেখে ত্রিসীমানার কোথাও নেই সেই লোকটা। শান্তি। লোকটা হয়তো কেউই না। এত বড় অফিসে কত রকম লোক আসছে যাচ্ছে। মনের গভীর গহনে কত যে কালো কালো ভাবনা ঝাঁকুনি খেয়ে তারা উঠে আসে ওপরে যেন মজা পুকুরের পচা পাঁক।

বিদায় বেলা, ১৮ অক্টোবর

আর কয়েক ঘণ্টা বাদে আমরা ছাড়া দলের আর সবাই রওনা দেবে গৌহাটির দিকে। অপর্ণা দত্ত দিল্লির প্লেনে উঠবেন। দাশগুপ্তদের পরিবার ছাড়া বাকিরা সবাই আকাশ পথে আজই কলকাতা পৌঁছে যাবে। দীপক দুটো গাড়িতে মালপত্তর তুলছে। বিশ্বাস সকলের জলখাবারের তদারকি করছেন। সামনে পাঁচ-ছ ঘণ্টা জার্নি। তাছাড়া আজই শেষ দিন বলে বোধহয় বিশ্বাস আজ ভালরকম আয়োজন করেছে। চা, কফির সঙ্গে টোস্ট, ডিম সেদ্ধ, আলুমরিচ, হালুয়া। সায়ক বলল ওস্তাদের মার শেষ রাতে। ফ্রেন্ডস যা একটা ফিনিশিং টাচ দিল আমাদের এটাই মনে থাকবে। বাগচি বললেন– দাশগুপ্তদাকে বলব বিশ্বাসের সঙ্গে কোলাকুলি করে বিদায় নিতে।

আমি এদের কথা শোনার ফাঁকে শতদলকে লক্ষ্য করছিলাম। তার মনের ভাব বোঝা কঠিন। কিন্তু এই প্রথম সে অকৃতকার্য হল বলা যায়। আর এক ঘণ্টার মধ্যে এরা চলে যাবে। অথচ আমরা এখনও কানাগলিতেই। আমরা ভালুকপং থেকে বেরোব কাল। গৌহাটি পৌঁছে থাকব এক দিন। সেভাবেই আমাদের ফেরার টিকিট। তার পরদিন কলকাতা। প্রায় তিন দিন পর। কলকাতার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র মোবাইলটা নিথর হয়ে আছে। শতদল হাতের মুঠোয় ধরে আছে যন্ত্রটা যাতে বাজলেই ধরতে পারে। এটুকু ছাড়া ওর মধ্যে অস্থিরতার কোন চিহ্ন নেই।

কালকের ঘটনার পর অরিন্দম আমাদের একটু এড়িয়ে চলছেন। শতদল বলল– প্রবীর অরিন্দম বাগচীর সঙ্গে একটু খোলাখুলি কথা বলে নাও। দরকার হলে নিজের পরিচয় দিও।

দীপককে দিয়ে অরিন্দমকে ডাকানো হলে পর প্রবীর বলল– শেষবেলায় বলতে অসুবিধে নেই আমরা মলয় দত্তর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করছি। কাল আপনাকে অপর্ণা দত্তর সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম। ওঁকে একটু আপসেট মনে হয়েছিল– আপনাদের কি আগে থাকতে পরিচয় ছিল?

অরিন্দম খুবই আশ্চর্য হয়ে বলল– ওটা এ্যাকসিডেন্ট নয়? আমরা সবাই তো তাই জানি। আপনাদের কোন ভুল হচ্ছে নাতো?

প্রবীর বলল– পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়ে খুব শিওর হয়েই বলছি। আপনি এখন বলুন কাল অপর্ণা দত্তর সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছিল?

– অরিন্দম যেন ঠিকই আন্দাজ করেছে। এভাবে বললে– তাই বলুন আপনারা পুলিশের লোক। তাই অত জিজ্ঞাসাবাদ। কাল কি হল– ওভাবে আপনাদের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে থেকে আমি এই ভয়টাই করছিলাম যে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে ভীমরতি ধরা ব্যাচেলর বুড়ো ভাবছেন। ঘটনাটা কি হয়েছিল বলি– তাওয়াং পৌঁছনোর আগের দিন দিরাংয়ে পৌঁছে আমরা সবাই রিলাক্স করছি। মি. এবং মিসেস দত্তও আমার সঙ্গে লনে বসে ছিলেন। বেণুগোপাল আর প্রত্যয় বল খেলছিল দৌড়ে দৌড়ে। আমরা ঘরে চলে আসার পরও দত্তরা বসে ছিল। আমি বাথরুমে ফ্রেশ হতে ঢুকেছিলাম। বেরিয়ে দেখি অপর্ণা দত্ত বসে আছেন আমাদের ঘরে। মনে হল যেন কাঁদছেন। চোখে চশমা ছিল না বলে ভাল করে বুঝতে পারিনি। আমি বেরোতেই বেণু বলল দুটো ব্যাচেলরের ঘরে মহিলা বেমানান। উনি তক্ষুনি চলে গেলেন। তারপর তো কত কাণ্ড ঘটল। সেদিনের জন্য যে ওঁকে স্যরি বলব, সাউথ ইন্ডিয়ান কনজারভেটিভনেসের সঙ্গে আমার যে কোন সম্পর্ক নেই, বেণুর অত রাফলি ওঁর সঙ্গে কথা বলা উচিত হয়নি, সে সব বলার আর চান্সই পেলাম না। বেটার লেট দ্যান নেভার তাই–

– আপনি দুঃখ প্রকাশ করলেন বলে উনি আপসেট হয়ে পড়লেন?

– একজ্যাকটলি। আমিও অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে হঠাৎ আপনাদের দেখে কেমন নার্ভাস হয়ে পড়লাম।

– আপনি বেণুগোপালকে পরে জিজ্ঞেস করেছিলেন উনি কেন আপনাদের ঘরে এসেছিলেন?

– হ্যাঁ। সে তো করবই। দত্তদের ঘরে ব্রিজের আড্ডা বসছে সেই জন্য ডাকতে এসেছিলেন। তা আমরা দুজনেই ওই রসে বঞ্চিত। তাই

'মাঙ্গাজি' কথাটার মানে কি? আমি চেয়েছিলাম। মৃত্যুপথ যাত্রী জল চেয়েছিল এমনটাই দেহাতীরা মনে করেছে কারণ সেটাই হয়ে থাকে। প্রথমে শুনে আমারও তাই মনে হয়েছিল। জলের মত এমন একটা নির্দোষ জিনিস উনি যদি কারও কাছে চেয়েও থাকেন সে দেবে না কেন? এটা অদ্ভুত না? উনি অবশ্য অন্য কিছুও চাইতে পারেন।

আর যাওয়া হয়নি।

– দরকার হলে আবার যোগাযোগ করব– এই বলে প্রবীর জিজ্ঞাসাবাদের তিক্ততা ঢাকতে একটা উষ্ণ করমর্দন করল।

একজন একজন করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাকিরা জিপে উঠছে। আমার মত প্রবীরও হতাশ। অরিন্দম বাগচী বললেন– আমরা আজ রাতেই কলকাতা। আপনারা আরও তিনদিন পাহাড়ের শোভা উপভোগ করুন। বেড়াতে ভাল লাগে আবার ফিরবার সময়ে কলকাতা টানতে থাকে তাই আমার ফেরাটা সব সময়ে প্লেনে।

– কে যে আপনার জন্য বসে আছে জানি না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে একপাল ছেলেপুলে বাবা বাবা বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকের ওপর– বেণুগোপাল বলল হেসে হেসে।

– আপনার জন্যও তো কেউ অপেক্ষা করে নেই। আপনারই বা এত তাড়া কিসের? শতদল আচমকা বলে উঠল।

বেণুগোপাল প্রশ্নটা বুঝতে এক মুহূর্ত সময় নিল– তারপর বলল– জানলেন কি করে কেউ অপেক্ষা করে নেই?

– একা একা বেড়াতে এসেছেন– পরিবার থাকলে কি আর এমন হয়?

– হয়। কটা পরিবার আপনি দেখেছেন?

আমার মনে হল বেণুগোপাল ঠিকই বলেছে। প্রতিটি পরিবারের আলাদা চরিত্র। আলাদা অঙ্ক।

হাওয়া সামান্য গরম হয়ে উঠেছিল। শতদল কিছু বলার আগে শায়কও ঝাল মেটাবার সুযোগ পেয়ে বলে উঠল– অরিন্দমদার কাছে আপনাদের পরিচয় জানলাম। অবশ্য আপনাদের অস্বাভাবিক কৌতূহল দেখে আমরা আগেই বুঝেছি আপনারা সাধারণ ট্যুরিস্ট নন। আমরা নিজেদের মধ্যে সেকথা বলাবলিও করেছি। এখনও যদি কিছু অজানা থাকে তো জেনে নিন। আমরা সবাই আছি। হাতে পাঁচ মিনিট সময়ও আছে।

শতদল একমুহূর্ত সময় নিল মনস্থির করতে। তারপর শায়কের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল– আপনি ঠিকই ধরেছেন। গোপন করার দায় এত বেশি বলেই বোধ হয় আপনি সবার আগে সতর্ক হয়েছেন।

শায়ক রুখে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল বেণুগোপাল তার কাঁধে হাত রেখে তাকে শান্ত করে বলল– যা হবার হয়েছে। আপনাদের কৌতূহল মাঝে মাঝে অস্বস্তি আর বিরক্তি সৃষ্টি করলেও ওভার অল উই হ্যাড এ গুড টাইম। যাবার বেলায় ভালটাই মনে রাখুন সবাই।

বেণুগোপাল আর কথা কাটাকাটি এড়াবার জন্যই তাড়াতাড়ি শায়ককে নিয়ে জিপের দিকে এগিয়ে যায়। শতদলও খুব ক্যাসুয়ালি সেই ভাল– বলেই বেণুগোপালকে প্রশ্ন করে– আচ্ছা আপনার একটি পার্টনার আছে না?

– হ্যাঁ। কেন বলুন তো? বেণুগোপালের চোখে বিশুদ্ধ বিস্ময়।

– তার বাবা কি ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন। নেফার যুদ্ধে মারা যান?

– সেই রকমই শুনেছিলাম মনে হচ্ছে। খুব ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছে এটুকু জানি। কেন বলুন তো? এবার কিন্তু আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। বেণুগোপালের ভুরু কুঁচকে ওঠে।

– এমনি। কি নাম যেন আপনার পার্টনারের?

– রনজয় মুখার্জি।

জিপগুলোর চাকা গড়াতে শুরু করেছে। প্রত্যয় জানালা দিয়ে হাত বার করে নাড়তে লাগল। যতক্ষণ দেখা গেল আমরাও হাত নাড়লাম। গাড়িগুলো পথের বাঁকে মিলিয়ে গেলে পর প্রবীর বিরাট একটা শ্বাস ফেলে বলল– এবার?

শতদল তার কথার উত্তর না দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়ে জিজ্ঞেস করল মলয় দত্ত মরবার আগে কি বলেছিল মনে আছে?

– মাঙ্গাজি। সবার আগে সঠিক উত্তর দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম।

– একজ্যাক্টলি। এখন 'মাঙ্গাজি' কথাটার মানে কি? আমি চেয়েছিলাম। মৃত্যুপথ যাত্রী জল চেয়েছিল এমনটাই দেহাতীরা মনে করেছে কারণ সেটাই হয়ে থাকে। প্রথমে শুনে আমারও তাই মনে হয়েছিল। জলের মত এমন একটা নির্দোষ জিনিস উনি যদি কারও কাছে চেয়েও থাকেন সে দেবে না কেন? এটা অদ্ভুত না? উনি অবশ্য অন্য কিছুও চাইতে পারেন। তবে পরে ভেবে দেখেছি মৃত্যুর আগে মলয় দত্ত কি খুনীকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছিলেন? সেটাই স্বাভাবিক। হয়তো আসল শব্দটা অনভ্যস্ত দেহাতী কানে ধরা পড়েনি।

আমরা অবাক হয়ে শুনছিলাম। কথাটার মানে নিয়ে একেবারেই ভাবিনি। শতদল বলল তোমরাও একটু শব্দটার উৎস খোঁজ না– দেখ কি মেলে।

প্রবীর বলল– আমার দ্বারা ওসব হবে না। তবে মলয় দত্তর শেষ কথা থেকে খুনির পরিচয় যদি বেরিয়ে আসে সেটাই সব থেকে বড় প্রমাণ।

আমি নানাভাবে মাঙ্গাজি শব্দটা উচ্চারণ করছিলাম। মাঙ্গাজি– মানাজি– মাকাজি– মাখাজি।

শতদল বলল– এত শেষ বেলায় রাস্তা দেখতে পেলাম যে কিছুই করা গেল না।

• আগামী সংখ্যায়

ঋতা বসু
ভারতের কথাসাহিত্যিক

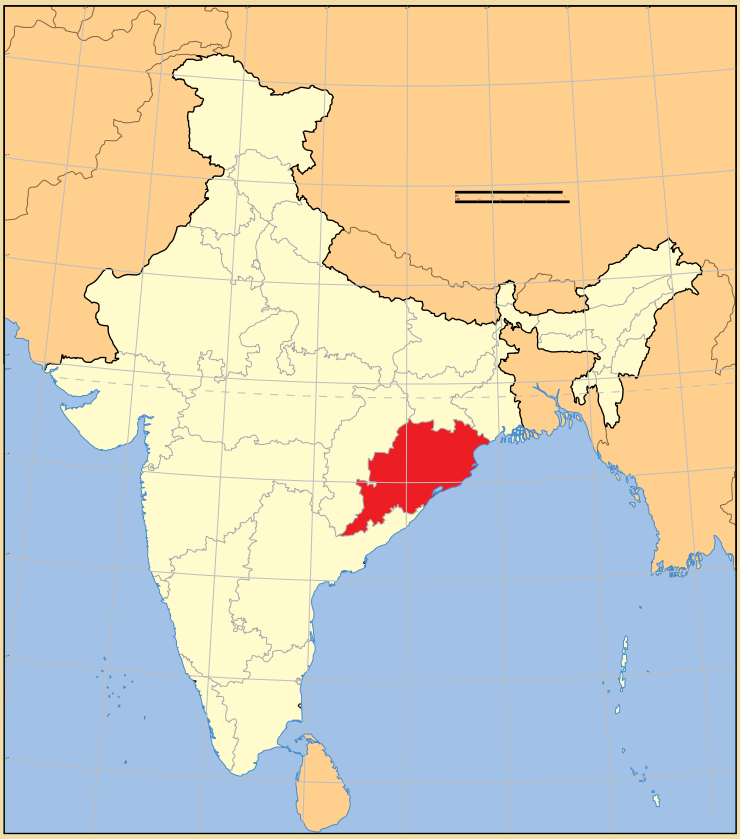

এক নজরে ওড়িশা

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব
রাজধানী	ভুবনেশ্বর
জেলা	৩০টি
প্রতিষ্ঠা	১ এপ্রিল ১৯৩৬
সরকার	
• শাসকবর্গ	ওড়িশা সরকার
• রাজ্যপাল	এস সি জমির
• মুখ্যমন্ত্রী	নবীন পাটনায়েক
• আইনসভা	এককক্ষবিশিষ্ট বিধানসভা ১৪৭ লোকসভা ২১, রাজ্যসভা ১০
• হাই কোর্ট	ওড়িশা হাই কোর্ট, কটক
ক্ষেত্রফল	
• মোট	১৫৫,৮২০ বর্গকিমি (৬০,১৬০ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	নবম
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	৪১,৯৪৭,৩৫৮
• ক্রম	একাদশ
• ঘনত্ব	২৭০/বর্গকিমি (৭০০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-OR
সরকারি ভাষা	ওড়িয়া
ওয়েবসাইট	www.odisha.gov.in

এস সি জমির

নবীন পাটনায়েক

রাজ্য পরিচিতি

ওড়িশা

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে অবস্থিত ওড়িশার উত্তর-পুবে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ছত্তিশগড় এবং দক্ষিণে অন্ধ্র প্রদেশ। ওড়িশার পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর বরাবর বালাসোর থেকে মালকানগিরি পর্যন্ত ৪৮৫ কিলোমিটার (৩০১ মাইল) তটরেখা চলে গেছে। আয়তনের নিরিখে এটি ভারতের নবম বৃহত্তর রাজ্য এবং জনসংখ্যার নিরিখে একাদশ। আদিবাসী জনসংখ্যার নিরিখে এটি ভারতের তৃতীয় বৃহত্তর আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্য। ওড়িয়া হচ্ছে সরকারি এবং ব্যাপক কথিত ভাষা, ২০০১ সালের শুমারি অনুযায়ী ৩ কোটি ৩২ লাখ লোক এ ভাষায় কথা বলে।

প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্য মৌর্য সম্রাট আশোক দখল করে নেন ২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ইতিহাসখ্যাত কলিঙ্গ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আজকের ওড়িশা সীমান্তে।

কোনার্কের সূর্য মন্দির

লিঙ্গরাজ মন্দির

উদয়গিরির হাতি গুম্ফা

আধুনিক ওড়িশা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১ এপ্রিল ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশ হিসেবে উড়িয়াভাষী অঞ্চল নিয়ে। ১ এপ্রিল ওড়িশা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। অঞ্চলটি উৎকল নামেও পরিচিত। জাতীয় সংগীত 'জনগণমন'তে এর উল্লেখ রয়েছে।

১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে অনন্তবর্মণ চূড়গঙ্গা কটককে এ অঞ্চলের রাজধানী হিসেব গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ যুগের অবসানের আগে বহু শাসক কটককেই রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করেন। পরে ভুবনেশ্বর ওড়িশার রাজধানী হয়।

নামের উৎপত্তি

ওড়িশা শব্দটি এসেছে প্রাচীন প্রাকৃত শব্দ 'ওড্র বিষয়' (উড্র বিভাষা' বা 'ওড্রা বিভাষা') থেকে। ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল-১-এর একটি তিরুমালাই লিপিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে ওড়িয়াভাষায় *মহাভারত* প্রণেতা সরল দাস এ অঞ্চলকে ওড়রা রাষ্ট্র বা ওড়িশা নামে আখ্যায়িত করেন। গজপতি রাজবংশের (১৪৩৫-৬৭) কপিলেন্দ্র দেবের পুরীর মন্দিরগাত্রের খোদাইয়ে এ অঞ্চলকে ওড়িশা বা ওড়িশা রাজ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ২০১১ সালে উড়িষ্যা থেকে রাজ্যের নামকরণ হয় ওড়িশা।

ইতিহাস

এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল খননে প্রাচীনতর প্যালিওলিথিক যুগের নানা জিনিস পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান করা যায় এখানে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের বসতি ছিল। *মহাভারত, বায়ু পুরাণ* ও *মহাগোবিন্দ সুত্তান্তের* মত প্রাচীন পাঠ্যবইয়ে কলিঙ্গের উল্লেখ আছে। ওড়িশার সবর জাতির উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধযানে বৈদিক ঐতিহ্য থেকে নয়, বরং উপজাতীয় ঐতিহ্য থেকে কলিঙ্গর উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্যসম্রাট অশোক তাঁর শাসনকালের অষ্টম বর্ষে রক্তক্ষয়ী কলিঙ্গযুদ্ধের পর কলিঙ্গ জয় করেন। তাঁর নিজের শিলালিপি থেকে জানা যায়, এই যুদ্ধে প্রায় ১ লাখ নিহত, দেড় লাখ লোক বন্দী এবং আরো বহু বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধে রক্তক্ষয় এবং যুদ্ধ-পরবর্তী যন্ত্রণা-হাহাকার-আর্তনাদে অশোকের মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি হয়। তিনি শান্তিবাদী হয়ে পড়েন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ১৫০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট খরবেলা (বাক্ট্রিয়ার ডেমেট্রিয়াস-১-এর সমসাময়িক) ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিরাট অংশ দখল করেন। খরবেলা ছিলেন জৈন শাসক। তিনি উদয়গিরি পাহাড়ের উপর একটি বিহারও নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে সমুদ্র গুপ্ত ও শশাঙ্কের মত শাসকরা এ অঞ্চল শাসন করেন।

পরে সোমবংশী রাজবংশ এতদঞ্চলকে একত্রিত করেন। যযাতি-২-এর শাসনামলে ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে গোটা অঞ্চল একটি একক রাজ্যে পরিণত হয়। যথাতি-২ সম্ভবত ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির নির্মাণ করেন। এদের পরে আসেন পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গা রাজবংশ। এ রাজবংশের উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন অনন্তবর্মণ চূড়গঙ্গা যিনি ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করেন। এ বংশেরই নরসিংহদেব-১ ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে কোনার্ক মন্দির নির্মাণ করেন।

পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গা রাজবংশের পরে গজপতি রাজবংশের সূচনা। মুঘল সাম্রাজ্যে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অঞ্চলটি তার অখণ্ডতা বজায় রাখে। তারপর বাংলার সুলতানাত রাজ্যটির দখল নেয়। কলিঙ্গর সর্বশেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দ দেব বিদ্রোহী রামচন্দ্র ভঞ্জর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। রামচন্দ্র ভঞ্জ প্রাণ হারান বায়জিদ খান কররানির হাতে। ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে বিহারের তদানীন্তন শাসক মানসিংহ-১ বাংলার কররানিদের হাত থেকে ওড়িশা পুনর্দখলে সৈন্য পরিচালনা করেন। তাদের নেতা কুতলু খান লোহানির সাম্প্রতিক মৃত্যুর কারণে তারা সন্ধি স্থাপনে রাজি হন। তারপর চুক্তি ভঙ্গ করে কররানি সৈন্যরা মন্দির নগরী পুরী আক্রমণ করে। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ আবার এসে এলাকায় শান্তি স্থাপন করেন।

সম্রাট শাহজাহান ওড়িশাকে প্রথম আকবরের পঞ্চদশ সুবার অন্তর্ভুক্ত করেন। কটক ছিল এর কেন্দ্রবিন্দু। সীমান্তে ছিল বিহার, বাংলা ও গোলকোণ্ডা সুবা এবং কিছু ছোটখাটো স্বাধীন ও উপ-প্রধান শাসকগোষ্ঠী। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশা ও বিজরের শাসকদের নবাবের ডেপুটি (পরে নিজাম) নিযুক্ত করে ছদ্ম স্বায়ত্ত-শাসিত সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭৫১ সালে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ মারাঠা সাম্রাজ্যের হাতে এ অঞ্চলকে ন্যস্ত করেন।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উত্তর ভারত দখল করে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় কর্নাটকি যুদ্ধে ওড়িশার দক্ষিণ তটরেখা দখল করে ক্রমান্বয়ে একে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সঙ্গে যুক্ত করে। ১৮০৩ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর ইংরেজরা মারাঠাদের পুরী-কটক অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে। ওড়িশার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৮৬৬ সালে ওড়িশার দুর্ভিক্ষে প্রায় ১০ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। এর পরে ব্যাপক সেচ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯০৩ সালে উৎকল সম্মিলনী সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর ওড়িয়াভাষী অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে একটি রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৩৬ সালের ১ এপ্রিল বিহার ও ওড়িশা দু'টি আলাদা প্রদেশে বিভক্ত হয়। এর ফলে ব্রিটিশ শাসনামলে ওড়িশা ভাষাভিত্তিক নতুন প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্যার জন অস্টেন হুব্বাক হন ওড়িশার প্রথম গভর্নর। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ২৭টি অধীনস্ত রাজ্য ওড়িশার সঙ্গে যুক্ত হয়।

ভূগোল

ওড়িশা ১৭.৭৮° ও ২২.৭৩° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮১.৭৩° পূর্ব ও ৮৭.৫৩° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর ক্ষেত্রফল ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭০৭ বর্গকিলোমিটার যা ভারতের মোট এলাকার ৪.৮৭ শতাংশ। এর তটরেখার দৈর্ঘ্য ৪৫০ কিলোমিটার। রাজ্যের পূর্বাঞ্চল উপকূলীয় সমভূমিতে অবস্থিত। এটা উত্তরে সুবর্ণরেখা নদী থেকে দক্ষিণে রুশিকুল্য নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভুবনেশ্বরের পূর্ব উপকূলীয় রেলওয়ে সদর দফতর

ধৌলির শান্তি স্তূপ

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে রথ যাত্রা

ঐতিহ্যবাহী ওড়িশি নাচ

চিলিকা হ্রদ উপকূলীয় সমভূমির অংশ। বঙ্গোপসাগরে নিপতিত ৬টি প্রধান নদী– সুবর্ণরেখা, বুধবলঙ্গা, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, মহানদী ও রুশিকূল্যর বালুরাশি এসব সমভূমিকে উর্বর করেছে। কটকের মহানদীর তীরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বীকৃত ধানের জিন ব্যাংক। রাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ পার্বত্যাঞ্চল। এর থেকে বড় ও গভীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে বড় বড় নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এসব উপত্যকায় মাটি উর্বর এবং ঘন বসতিপূর্ণ। ওড়িশায় আছে মালভূমি ও বিসর্পিল উঁচুভূমি। রাজ্যের সর্বোচ্চ বিন্দু দেওমালির উচ্চতা ১৬৭২ মিটার। অন্যান্য শৃঙ্গগুলি হচ্ছে সিংকারাম (১৬২০ মিটার), গোলিকোড়া (১৬১৭ মিটার) ও ইয়েন্দ্রিকা (১৫৮২ মিটার)।

জলবায়ু

রাজ্যে প্রধানত ৪টি ঋতু– এগুলি হচ্ছে শীতকাল (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি), প্রাক-বর্ষা (মার্চ-মে), দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ষা (জুন-সেপ্টেম্বর) এবং উত্তর-পূর্ব বর্ষা ঋতু (অক্টোবর-ডিসেম্বর)। তবে স্থানীয়ভাবে বছরকে ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে– বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির (শীতকাল)।

জীববৈচিত্র্য

২০১২ সালের এক বন জরিপে দেখা যায়, ওড়িশায় বনের পরিমাণ ৪৮ হাজার ৯০৩ বর্গ কিলোমিটার, যা রাজ্যের মোট ক্ষেত্রফলের ৩১.৪১ শতাংশ। এর মধ্যে ঘন বন (৭ হাজার ৬০ বর্গকিলোমিটার), মাঝারি ঘন বন (২১ হাজার ৩৩৬ বর্গকিলোমিটার) উন্মুক্ত বন (চন্দ্রাতপহীন, ২০ হাজার ৪৭৭ বর্গ কি.মি) ও গুল্মবন (৪ হাজার ৭৩৪ বর্গ কি মি)। রাজ্যে বাঁশ বনও আছে (১০ হাজার ৫১৮ বর্গ কি.মি), আছে ম্যানগ্রোভও (২২১ বর্গ কিমি)। কাঠ পাচারকারী, খনি, শিল্পায়ন ও গোচারণের ফলে বনভূমি দ্রুত কমে যাচ্ছে। তবে সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনের প্রচেষ্টাও চলছে।

অনুকূল জলবায়ু ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে ওড়িশার চিরহরিৎ ও বাষ্পীয় বনভূমি বুনো আর্কিডের প্রাকৃতিক প্রজননভূমি। রাজ্যে প্রায় ১৩০ প্রজাতির অর্কিড পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৯৭ প্রজাতি শুধু ময়ুরভঞ্জ জেলাতেই পাওয়া যায়। নন্দনকানন বায়োলজিক্যাল পার্কে এসব প্রজাতির অনেক অর্কিড পাওয়া যায়।

ময়ুরভঞ্জ জেলার উত্তরাঞ্চলে ২ হাজার ৭৫০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে সিমলিপাল জাতীয় উদ্যান সংরক্ষিত বন্যপ্রাণি ও বাঘ সংরক্ষণ এলাকা। এখানে ৯৪ প্রজাতির অর্কিড ও ১ হাজার ৭৮ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। শাল হচ্ছে প্রধান উদ্ভিদ। এ পার্কে হরিণ, বাংলার বাঘ, লেঙ্গুর, চারশিঙা এন্টিলোপ, ভারতীয় মোষ, ভারতীয় হাতি, ভারতীয় বৃহৎ কাঠবিড়ালী, ভারতীয় লেপার্ড, বনবিড়াল, সম্বর হরিণ ও বুনো ভল্লুকসহ ৫৫ জাতের স্তন্যপায়ী প্রাণি; পাহাড়ী ময়না, বাদামী হর্নবিল, ভারতীয় ফুটকি কাটা হর্নবিল, মালাবার ফুটকি কাটা হর্নবিলসহ ৩০৪ প্রজাতির পাখি; রাজগোখরা, পাহাড়ী ট্রাইকেরিনেট কচ্ছপসহ ৬০ প্রজাতির সরীসৃপ রয়েছে। নিকটবর্তী রামতীর্থে কুমীর প্রজনন কর্মসূচীও রয়েছে। রাজধানী ভুবনেশ্বরের কাছে ১৯০ বর্গকিলোমিটার সংরক্ষিত এলাকায় চান্দক হাতি সংরক্ষণশালা তৈরি করা হয়েছে। তবে নগরায়ন ও চারণভূমি বিস্তারের ফলে সমভূমি হ্রাস পাচ্ছে এবং হাতির পাল অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ২০০২ সালে প্রায় ৮০টি হাতি ছিল, ২০১২ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে ২০টিতে। অনেক হাতি চোরাশিকারী, গ্রামবাসীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে, কিছু ট্রেনে কাটা পড়েছে। হাতি ছাড়াও এ সংরক্ষণশালায় ভারতীয় লেপার্ড, বনবিড়াল ও চিতাবাঘ রয়েছে। কেন্দ্রপাড়া জেলার ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রফল ৬৫০ বর্গকিলোমিটার, এর মধ্যে ১৫০ কিলোমিটার ম্যানগ্রোভ। ভিতরকণিকায় গহিরামাঠ সৈকত বিশ্বের অলিভ রিড্‌লে সমুদ্র কচ্ছপের বৃহত্তম আবাসস্থল। এই কচ্ছপের অন্য দুই প্রধান আবাসস্থল হচ্ছে গ্যাঞ্জাম জেলার রাশিকূল্য ও দেবী নদীর মুখ। ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য বিপুলসংখ্যক লবণজলের কুমিরের জন্য বিখ্যাত। শীতকালে এখানে কালোমুকুট রাত সারস, ডার্টার, বাদামি সারস, ভারতীয় কর্মোর্যান্ট, ওরিয়েন্টাল সাদা ইবি, বেগুনী সারস প্রভৃতি পরিযায়ী পাখি আসে।

ওড়িশার পূর্ব-উপকূলে ১ হাজার ১০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ব্রাকিশ ওয়াটার (লবণ ও মিষ্টিজলের সংমিশ্রিত এলাকা) লেগুন চিলিকা হ্রদ ৩৫ কিলোমিটার লম্বা শুরু খাল হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এটি মহানদী দ্বীপের একটি অংশ। শুষ্ক মওসুমে জোয়ারে এখানে লবণ জল ঢোকে। বর্ষাকালে নদীগুলো লেগুনে ঢুকে জলের লবণাক্ততা কমায়। কাস্পিয়ান সাগর, বৈকাল হ্রদ, রাশিয়া এবং এশিয়ার মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব এলাকা, লাদাখ ও হিমালয় থেকে পরিযায়ী পাখিরা শীতকালে চিলিকায় ভিড় করে। এসব পাখির মধ্যে উইরেশিয়ান উইগিয়ন, পিনটেইল, বার-হেডেড গুজ, গ্রে লেগ গুজ, ফ্লেমিংগো, মালার্ড ও গোলিয়াথ হেরন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিলিকায় স্বল্পসংখ্যক ইরাবতী ডলফিনও পাওয়া যায়। তাছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে ডানাহীন শুশুক, বোতলনাক ডলফিন, হাম্পব্যাক ডলফিন ও স্পাইনার ডলফিন দেখা যায়।

সরকার ও রাজনীতি

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতের সকল রাজ্যে সংসদীয় সরকার কাঠামো বিদ্যমান। ভারতীয় সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। নিম্নকক্ষ লোকসভায় ওড়িশার প্রতিনিধির সংখ্যা ২১। উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় ওড়িশার প্রতিনিধি ১০ জন। রাজ্যের বিধানসভা এঁদের নির্বাচিত করে।

ওড়িশার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি হচ্ছে বিজু জনতা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি ও সিপিআই (এম)। ২০১৪-র রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে নবীন পাটনায়েকের নেতৃত্বাধীন বিজু জনতা দল উপর্যুপরি চতুর্থবারের মত ক্ষমতায় আসে।

ওড়িশার রাজ্য বিধানসভার আসন সংখ্যা ১৪৭। এছাড়া রাজ্যপাল এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের একজনকে মনোনয়ন দেন। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। বিধানসভার

ওড়িশা সচিবালয়

গোপালপুর বন্দর

নন্দন কাননের সাদা বাঘ

চিলিকা হ্রদের পরিযায়ী পাখি

মেয়াদ পাঁচ বছর।

প্রশাসনিক ইউনিটসমূহ

ওড়িশায় ৩০টি জেলা। এগুলি হচ্ছে: অঙ্গুল, বলাঙ্গির, বালাসোর, বড়গড়, ভদ্রক, বৌধ, কটক, দেওগড়, ঢেঙ্কানাল, গজপতি, গ্যাঞ্জাম, জগৎসিংহপুর, জাজপুর, ঝরসুগুড়া, কান্ধামাল, কালাহান্ডি, কেন্দ্রপাড়া, কেওনঝর, খোরদা, কোরাপুট, মালকানগিরি, ময়ূরভঞ্জ, নবরংপুর, নয়াগড়, নওপদা, পুরী, রায়গড়, সম্বলপুর, সুবর্ণপুর ও সুন্দরগড়। ৩০টি জেলা ৩টি রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলো হচ্ছে: উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য এবং তাদের সদর দপ্তর যথাক্রমে সম্বলপুর, বেরহামপুর ও কটক। প্রত্যেকটি বিভাগে ১০টি জেলা।

রাজ্যের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর ভুবনেশ্বর। অন্যান্য প্রধান নগরগুলো হচ্ছে: বেরহামপুর, কটক, রাউরকেলা ও সম্বলপুর। এসব নগরে সিটি কর্পোরেশন বিদ্যমান।

অর্থনীতি

ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক ধারায় বলা যায়, ওড়িশার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিক। জাতীয় গড়ের তুলনায় ওড়িশার প্রবৃদ্ধি বেশি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির নিজস্ব প্রকল্পের অধীনে নগর উন্নয়ন মন্ত্রক ২০১৬ সালে যে স্মার্ট সিটির তালিকা করেছে, সেখানে ভুবনেশ্বর তালিকার শীর্ষে। এর ফলে ৫ বছরে উন্নয়নের জন্য এ নগরী পাবে ৫০ হাজার ৮০২ কোটি রুপি।

শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন

ওড়িশার প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরান এবং দীর্ঘ তটরেখা বিদেশী পর্যটকদের বিনিয়োগের পছন্দের গন্তব্য। কয়লা উৎপাদনে ওড়িশা পঞ্চম, লৌহ আকরিক উৎপাদনে চতুর্থ, বক্সাইট মজুতে তৃতীয়। ক্রোমাইট উৎপাদনের সিংহভাগ আসে এ রাজ্য থেকেই। রাউরকেলা স্টিল প্লান্ট ভারতের প্রথম সরকারি খাতের সমন্বিত স্টিল প্ল্যান্ট জার্মানির যৌথ সহযোগিতায় নির্মিত।

আর্সেলর-মিত্তাল ১০০০ কোটি ডলারের আরেকটি মেগা স্টিল প্রকল্পে বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। রাশিয়ার প্রধান ম্যাগনিটোগরস্ক্ আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানি ওড়িশায় একটি ১০এমটি স্টিল প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। ওড়িশা এলুমিনিয়াম, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্ট, পেট্রোকেমিক্যাল ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতেও নজীরবিহীন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে রিলায়েন্স পাওয়ার (অনিল আম্বানি গ্রুপ) ঝরসুগুড়া জেলার হিরমায় ১৩০০ কোটি ডলারের পৃথিবীর বৃহত্তম বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করতে যাচ্ছে।

২০০৯ সালে ওড়িশা গুজরাটের পরেই দেশীয় বিনিয়োগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। তৃতীয় স্থানে ছিল অন্ধ্র প্রদেশ। দেশের মোট বিনিয়োগে ওড়িশার অবদান ১২.৬ শতাংশ। ২০০৮-০৯ সালে ওড়িশার প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৪৯ শতাংশ, যেখানে সর্বভারতীয় প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৪৯ শতাংশ। গুজরাট, বিহার, উত্তরাখণ্ডের পর ওড়িশা ভারতের চতুর্থ দ্রুততম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী রাজ্য।

পরিবহন

ওড়িশা সড়ক, রেলপথ, বিমান,ও সমুদ্রপথে যুক্ত। ভুবনেশ্বরের সঙ্গে সারাদেশের সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ রয়েছে। কিছু মহাসড়ক চার লেনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ভুবনেশ্বর ও কটকের মধ্যে মেট্রো রেল চালুর কাজ শুরু হয়েছে– দুই গন্তব্যের দূরত্ব ৩০ কিমি।

বিমান

ওড়িশায় মোট ১৭টি বিমানপোত ও ১৬টি হেলিপ্যাড রয়েছে। ওড়িশা সরকার ঝরসুগুড়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ আভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। অঙ্গুল, ধামরা, কলিঙ্গনগর, পারাদ্বীপ ও রায়গড়ে রাজ্যের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাজ্য বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য গ্রিনফিল্ড বিমান বন্দর রয়েছে। বরাবিল, গোপালপুর, ঝরসুগুড়া ও রাউরকেলায় বিদ্যমান বিমানক্ষেত্র ওড়িশার নিজস্ব বিমান সংস্থা 'এয়ার ওড়িশা'র বিমান চলাচলের জন্য উন্নত করা হয়েছে। ওড়িশার বিমানবন্দরগুলি হচ্ছে অঙ্গুল-সাবিত্রী জিন্দাল এয়ারপোর্ট, ভবানী পাটনা-উৎকল এয়ারট্রিপ, ভুবেনশ্বর-বিজু পাটনায়েক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ব্রহ্মপুর-বেরহামপুর বিমান বন্দর, কটক-চারবাটিয়া বিমানঘাঁটি; জয়পুর বিমানবন্দর, ঝরসুগুড়া বিমান বন্দর, রাউরকেলা বিমান বন্দর, সম্বলপুর-হিরাকুড় এয়ারট্রিপ।

সমুদ্র বন্দর

ওড়িশার দীর্ঘ সমুদ্রতটে অনেকগুলো সমুদ্র বন্দর রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে: ধামরা বন্দর, গোপালপুর বন্দর, পারাদ্বীপ বন্দর, সুবর্ণরেখা বন্দর, অস্তরঙ বন্দর, চাঁদিপুর বন্দর।

রেলপথ

ওড়িশার প্রধান প্রধান নগরীর সঙ্গে দেশের প্রধান প্রধান নগরীর দৈনিক ও সাপ্তাহিক ট্রেন যোগাযোগ বিদ্যমান। ওড়িশার অধিকাংশ রেলপথ সংযোগ ইস্ট কোস্ট রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন, যার সদর দপ্তর ভুবেনশ্বরে। তবে কিছু রেল সংযোগ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব কেন্দ্রীয় রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন।

জনমিতি

২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী ওড়িশার মোট জনসংখ্যার ৪ কোটি ১৯ লাখ ৪৭ হাজার ৩৫৮ জন। যার ৫০.৫৪ শতাংশ পুরুষ। প্রতি হাজার পুরুষে ৯৭৮ জন নারী। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৬৯ জন। প্রধান জাতিগত জনগোষ্ঠী হচ্ছে উড়িয়া। উড়িয়া সরকারি ভাষা। জনসংখ্যার ৮১.৮ শতাংশ মানুষ মাতৃভাষা উড়িয়ায় কথা বলে।

পুরীর মালতিপতপুর বাস স্ট্যান্ড

চিলিকা হ্রদের ইরাবতী শুশুক

মহানদীতে সূর্যোদয়

লিঙ্গরাজ মন্দির এবং রাউরকেলা স্টিল প্ল্যান্ট

সংখ্যালঘুদের ভাষা হচ্ছে: বাংলা, হিন্দি, উর্দু, তেলুগু, হো, সাঁওতালি। উল্লেখযোগ্য উপজাতি হচ্ছে: হো, সাঁওতাল, বোন্দা, মুন্ডা, ওঁরাও, খান্দা, মহালি ও কোরা।

২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী সাক্ষরতার হার ৭৩ শতাংশ, এর মধ্যে ৮২ শতাংশ পুরুষ, ৬৪ শতাংশ নারী।

ধর্ম

২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী, ওড়িশায় ৯৩.৬৩ শতাংশ হিন্দু, ২.৭৩ শতাংশ খ্রিস্টান, ২.১৭ শতাংশ মুসলমান, ১.১৪ শতাংশ সর্বপ্রাণবাদী, ১.০৫ শতাংশ শিখ, ০.০৩ শতাংশ বৌদ্ধ, ০.০২ শতাংশ জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে।

ওড়িশার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু এবং রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ওড়িশা অনেক হিন্দু ব্যক্তিত্বের আবাসভূমি। যেমন সন্ত ভীম ভোই ছিলেন মহিমা গোষ্ঠী আন্দোলনের নেতা, সরল দাস উড়িয়া ভাষায় *মহাভারত* অনুবাদ করছিলেন, চৈতন্য বৌদ্ধবাদী বৈষ্ণব, যিনি নির্গুণ মাহাত্ম্য প্রণয়ন করেছিলেন, গীতগোবিন্দের লেখক জয়দেব। ওড়িশার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মানসগঠনে এঁদের অবদান অসামান্য। ১৯৪৮ সালে উড়িশা মন্দির কর্তৃপক্ষের আইন প্রণয়নের ফলে ওড়িশার সকল মন্দির হরিজনসহ সকল হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত।

ওড়িশার সম্ভবত প্রাচীনতম ১০৪২ সালের পাণ্ডুলিপি *মাদলপঞ্জি* পুরী মন্দির সংরক্ষিত আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে জগন্নাথ দাস রচিত *ভাগবত* বিখ্যাত হিন্দু উড়িয়া পাণ্ডুলিপি। আধুনিককালে মধুসূদন রাও প্রধান উড়িয়া লেখক। ব্রাহ্মসমাজী মধুসূদন বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আধুনিক উড়িয়া সাহিত্যের সূচনা করেন।

শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে ওড়িশা যথেষ্ট এগিয়ে। ভুবনেশ্বরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ইন্টারন্যশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি; সম্বলপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট; ব্রহ্মপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ; বুরলার বীর সুরেন্দ্র সাই ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি; কটকের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্রহ্মপুরের বেরহামপুর ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি অগ্রগণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাউরকেলার বিজু পাটনায়েক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি পরিচালিত ওড়িশা জয়েন্ট এনট্রাস পরীক্ষা দিয়ে রাজ্যের প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হতে হয়। ২০০৩ সাল থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের জন্য অল ইন্ডিয়া প্রি-মেডিক্যাল টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হয়।

ভিতরকণিকার ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল

কলিঙ্গ পুরস্কার

ওড়িশার মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি খুবই আস্থাশীল। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয় করার জন্য ইউনেস্কোর অধীনে কলিঙ্গ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট এ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। ১৯৫২ সাল থেকে বিজু পাটনায়েকের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে কলিঙ্গ পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয়। কলিঙ্গ পুরস্কার প্রাপ্ত ২৫জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কার লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

সংস্কৃতি

ওড়িশার সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এসবের মধ্যে ওড়িশি নৃত্য ও সংগীত হচ্ছে শাস্ত্রীয় শিল্পকলা। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে ওড়িশি হচ্ছে ভারতের প্রাচীনতম টিকে থাকা নৃত্যধারা, এর বয়স প্রায় দু' হাজার বছর। ২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে লেখা ভরতমুনির *নৃত্যশাস্ত্রে* এর উল্লেখ আছে। ব্রিটিশ আমলে এ নৃত্যধারটি প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে স্বাধীনতার পর কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ নৃত্যগুরুর প্রচেষ্টায় এর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ঘুমুর নাচ, ছৌ নাচ, মহারি নাচ ও গুটিপুয়া ওড়িশার প্রচলিত নৃত্যফর্ম।

পর্যটন

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের উচ্চতা ১৫০ ফুট (৪৬ মিটার)। অন্যদিকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের উচ্চতা ২০০ ফুট (৬১ মিটার)। 'পবিত্র স্বর্ণালী ত্রিভুজ'-এর বৃহত্তম মন্দিরসমূহের অন্যতম কোনার্ক সূর্যমন্দিরের একটি মাত্র অংশ আজ বিদ্যমান রয়েছে এবং এর আকার বিস্ময় উদ্রেককারী। এটি উড়িশার স্থাপত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। জগৎসিংহপুর জেলার ভক্তদের ভজন-পুজনের মন্দির হচ্ছে সরলা মন্দির। এটি ওড়িশার অন্যতম পবিত্র স্থান এবং প্রধান পর্যটক আকর্ষণ কেন্দ্র। কেওনঝর জেলায় অবস্থিত মা তারিণী মন্দির তীর্থযাত্রীদের বিখ্যাত গন্তব্য। প্রতিদিন ভক্তরা তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য মা তারিণীকে হাজার হাজার নারকেল উৎসর্গ করে থাকেন।

ওড়িশার পরিবর্তনশীল ভূমিরূপ– পূর্বঘাটের বনভূমি থেকে উর্বর নদীগর্ভ– এক অসাধারণ প্রতিবেশ-ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। এটি উদ্ভিদ ও জীব সম্পদের অনিঃশেষ ভাণ্ডার যা পরিযায়ী পাখি ও সরীসৃপদের আকৃষ্ট করে। ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান এর দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ-ব্যবস্থার জন্য বিখ্যাত। চিলিকা (এশিয়ার বৃহত্তম ব্রাকিশ ওয়াটার হ্রদ)-র পাখিরালয় এবং সিমলিপাল জাতীয় উদ্যানের বাঘ সংরক্ষণশালা ও ঝর্না ওড়িশার প্রতিবেশ-পর্যটনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ওড়িশার কান্ধামাল জেলায় অবস্থিত দারিংবাড়ি পার্বত্য স্টেশন 'ওড়িশার কাশ্মীর' নামে পরিচিত। শান্ত ও প্রাকৃতিক নিসর্গের লীলাভূমি চাঁদিপুর এখনও পর্যটকদের কাছে অপরিচিত। চাঁদিপুর সমুদ্রসৈকতে ভাটার টানে প্রায় ৪ কিলোমিটার চর জাগে, আবার জোয়ারে ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে যায়, দেখতে অপূর্ব লাগে।

অনুবাদ মানসী চৌধুরী
সূত্র উইকিপিডিয়া

রান্নাঘর

ওড়িশার রান্না

ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক রান্নার তুলনায় ওড়িশার রান্না অপেক্ষাকৃত কম তেল-মসলার খুবই সুগন্ধি খাবার। এখানে ভাত প্রধান খাদ্য। রান্নায় সরিষার তেল ব্যবহৃত হয়, তবে মন্দিরের রান্নায় ঘি ব্যবহৃত হয়। আগের দিনে কলা বা শালপাতা বা একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া যায় এমন থালে খাবার পরিবেশন করা হত।

উড়িয়া রাঁধুনীদের বিশেষ করে পুরী অঞ্চলের রাঁধুনীদের রান্নায় তাদের সহজ প্রাপ্যতার জন্য খোঁজ করা হত, হিন্দু লিপিতে এমন দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উড়িয়া রাঁধুনীরা বাংলায় রান্নার কাজে এসে এখানে অনেক পদের রান্নার প্রচলন করে।

খাদ্য-তালিকায় দইয়ের নানা পদ থাকে। এখানকার অনেক মিষ্টিদ্রব্য তৈরিতে ঘি ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণ পাচকের প্রভূত চাহিদা থাকায় উড়িয়ারা ছদ্মপরিচয়ে রান্নার কাজে নিযুক্ত হত। কলা, কাঁঠাল ও পেঁপে উড়িয়া রান্নার প্রধান উপাদান। তরকারিতে কাঁচা আমের চুর বা তেঁতুল দেওয়া হয়। ওড়িয়া রান্নায় পাঁচফোড়নের ব্যাপক ব্যবহার আছে। সরিষা, জিরা, মেথি, মৌরি ও কালোজিরার মিশেল হচ্ছে পাঁচফোড়ন। অধিকাংশ খাবারে পেঁয়াজ, আদা ও রসুন থাকে। মন্দিরের রান্নায় অবশ্য আদা-রসুন-পেঁয়াজের ব্যবহার থাকে না। হলুদ ও শুকনো মরিচের গুঁড়ো সব রান্নাতেই থাকে।

আঞ্চলিক বিভিন্নতা

পুরী ও কটক অঞ্চলের খাবারে জগন্নাথ মন্দিরের প্রভাব আছে। অপরদিকে বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে কালোজিরা, সরিষা বাটা খুব ব্যবহৃত হয়। রান্নার পদে মিষ্টির ধারা বেশি। আবার অন্ধ্রপ্রদেশ সন্নিহিত অঞ্চলে কারি পাতা ও তেঁতুলের ব্যবহার সুপ্রচুর। ব্রহ্মপুর অঞ্চলের রান্নায় দক্ষিণ ভারতীয় রান্নার প্রভাব বেশি। সেখানে বসবাসকারী তেলুগুরা নতুন নতুন ওড়িয়া রান্না উদ্ভাবন করেছেন।

মন্দিরের প্রসাদ

মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতাকে ভোগ নিবেদনের জন্য প্রসাদ রান্না করা হয়। জগন্নাথ মন্দিরে মহাপ্রসাদ তৈরি হয়। মহাপ্রসাদে ৫৬পদের রান্না থাকে। একে বলা হয় চাপান ভোগ। মাথুরাবাসীদের বজ্রবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে একাদিক্রমে সাতদিন আঙুলে ধারণ করে রেখেছিলেন। ফলে আরদিন তাঁর খাওয়া হয়নি, এ কারণে এই বিস্তৃত চাপান ভোগের ব্যবস্থা।

মাছ ও সামুদ্রিক খাবার

মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ-কাঁকড়া উপকূলীয় অঞ্চলে খাওয়া হয়। মসলাসহযোগে চিংড়ি বা গলদা চিংড়ির তরকারি খুব জনপ্রিয়। নদী বা সেচ-খালে মিষ্টিজলের মাছ সুলভ। রুই, ভাকুড় ও মিরিকালি রান্নায় ব্যবহৃত বিখ্যাত স্বাদুজলের মাছ।

ভাত ও রুটি

পাখাল হচ্ছে চাল রান্না করে জল দিয়ে সারারাত রেখে দেওয়া ভাত। একে বলে বাসি পাখাল। রান্না ভাত সাজো পাখাল। কাঁচা লংকা, পেঁয়াজ, দই, বড়ি ইত্যাদি সহযোগে খাওয়া হয়। এটি সাধারণত গ্রীষ্মকালে খুব চলে। এটি পান্তাভাতের ওড়িশি সংস্করণ। কাঁচা লংকা-পেঁয়াজ সহযোগে পান্তা-ইলিশ যেমন বাঙালির কাছে খুবই প্রিয়।

খিচুরি : ডাল দিয়ে রান্না ভাত।

পালাউ: সবজি ও রাইসিম দিয়ে তৈরি। এটি পিলাফের ওড়িয়া সংরক্ষণ।

কনিকা: রাইসিন ও বাদাম দেওয়া মিষ্টি ভাত।

ঘি ভাত: দারুচিনি দিয়ে ঘিয়ে ভাজা ভাত।

ডাল

ডালমা: ডাল ও সবজি দিয়ে তৈরি হয়। পাঁচমিশালী ডালের সঙ্গে কাঁচা পেঁপে, কাঁচকলা, বেগুন, কুমড়া, লাউ প্রভৃতি টুকরো টুকরো করে কেটে রান্না করা হয়। হলুদ, সরিষা ও পাঁচফোড়ন তেলে দিয়ে সম্বরা দেওয়া হয়।

ডাল: এক রকমের ডাল যেমন মুগ, মুসুরি, চানা, ছোলা দিয়ে রান্না তরল পানীয় তরকারি।

তরকারি: সাঁতুল, রাই, রসা নানা রকমের পদ রান্না করা হয়।

সাঁতুল: কুচি কুচি করে সবজি কেটে রসুন, কাঁচা লংকা, সরিষার তেল ও মসলা দিয়ে রান্না করা হয়।

ছাতু রাই: মাশরুম ও সরিষা দিয়ে রান্না।

আলু-পটল রসা: আলু ও পটলের ঝোলবিহীন রসা তরকারি।

কলার থোড়: কলার থোড় সরিষা দিয়ে রান্না। ডালমার সঙ্গে থোড়-রাই পরিবেশন করা হয়।

বেসর: সরিষা বাটা সবজি পাঁচফোড়ন দিয়ে রান্না।

খাট্টা ও চাটনি

খাট্টা বা চাটনি ওড়িয়া থালির সহযোগী হিসেবে পরিবেশিত হয়।

দই-বেগুন: দই ও বেগুন দিয়ে প্রস্তুত।

খেজুরি খাট্টা: টমেটো ও খেজুর দিয়ে টক মিষ্টি রান্না।

আম খাট্টা: কাঁচা আম দিয়ে তৈরি টক।

ওউ খাট্টা: চালতার টক।

ধনিয়া পাতার চাটনি: ধনিয়া পাতার চাটনি।

শাগ (শাক্)

ওড়িয়ারা প্রচুর কাঁচাশাক রান্না করে খায়। পাঁচফোড়ন, পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে অথবা না দিয়ে রান্না শাক তারা পাখালের সঙ্গে খেয়ে থাকে। লাল শাক, ডাঁটা শাক, গম শাক, খাড়া শাক, পুঁই শাক, সজনে শাক ভাজা উড়িয়াদের খুব প্রিয়।

পিঠা

পিঠা ও মিষ্টি ঐতিহ্যবাহী উড়িয়া ডিশে থাকবেই। এসবের মধ্যে আসগোলা, পোড়া পিঠা, এনদুরি পিঠা, চিতই পিঠা, অরিসা পিঠা, কাকর পিঠা, মণ্ডা পিঠা, পারিজাত পিঠা, নুরুখুরুম পিঠা, চন্দ্রকান্তি পিঠা উল্লেখযোগ্য।

মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্য

মাছ বেসর: সরিষা বাটা দিয়ে তৈরি মাছের তরকারি।

মাছ মহুর: মাছের সঙ্গে সবজি দিয়ে রান্না তরকারি– মাছ ঝোল, চিংড়ি ঝোল, চিংড়ি চচ্চড়ি।

ছেচড়া: ছোট মাছ ভাজা।

চিংড়ি মালাই তরকারি: চিংড়ির তরকারি। কাঁকড়া ঝোল প্রভৃতি।

ডেজার্ট ও মিষ্টি

ক্ষীর: দুধ ও চাল দিয়ে মিষ্টি রান্না। **ছানাপোড়া:** মাখনের তৈরি মিষ্টি চিনির রসে ডুবিয়ে আগুনে সেকে রান্না করা। ছানা গজা, মালপোয়া, কোরা, ক্ষীর জিলাপী, ছানা ক্ষীর, ছানা ঝিলি।

রসগোল্লা: ৭০০ বছর আগে পুরীর মহালক্ষ্মীর ভোগে তৈরি ছানার চিনির রসে ডোবানো গোল মিষ্টি। তবে কলকাতার মানুষদের দাবি ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার ময়রারা রসগোল্লা উদ্ভাবন করে। আরও আছে গোলাপ জামুন, রসবালি, রসমালাই, আড়সি, আত্তাকালি, জিলাপি।

উইকিপিডিয়া থেকে অনুবাদ মানসী চৌধুরী

আজন্ম বিদ্রোহী কবি

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ ও দার্শনিক যিনি বাংলা কাব্যে অগ্রণী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রগতিশীল প্রণোদনার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ দুই বাংলাতেই তাঁর কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত। কবিতায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁকে *বিদ্রোহী কবি* অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর কবিতার মূল বিষয় ছিল মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার এবং সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে এই বাঙালি কবি জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ কাজী আমিনউল্লাহর পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান তিনি। তাঁর বাবা ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম এবং মাযারের খাদেম। শৈশবে তাঁর ডাকনাম ছিল *দুখু মিয়া*। প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পর স্থানীয় মসজিদে তিনি কিছুদিন মুয়াযযিন হিসেবেও কাজ করেন। বাল্য বয়সেই লোকশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে *লেটো* নামে প্রসিদ্ধ রাঢ় বাংলার কবিতা, গান ও নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক চর্চার ভ্রাম্যমাণ একটি নাট্যদলে যোগ দেন। তাঁর চাচা কাজী বজলে করিম ছিলেন চুরুলিয়া অঞ্চলের লেটো দলের বিশিষ্ট ওস্তাদ এবং আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় তাঁর দখল ছিল। ধারণা করা হয়, বজলে করিমের প্রভাবেই নজরুল লেটো দলে যোগ দিয়েছিলেন। লেটো দলে থাকতেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। এসময়ে তাঁকে ইসলাম ছাড়াও হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণসমূহ পড়তে হয়।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনির ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে নজরুল করাচি যান। সেখানে হাবিলদার নজরুল ফার্সি ভাষা রপ্ত করেন। যুদ্ধশেষে কলকাতায় ফিরে তিনি ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন এবং সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। প্রথম দিকে *মোসলেম ভারত*, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, *উপাসনা* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। এসময় তিনি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। প্রকাশ করেন *বিদ্রোহী* এবং *ভাঙার গানের* মত কবিতা; *ধূমকেতুর* মত সাময়িকী। জেলে বন্দী অবস্থায় লেখেন *রাজবন্দীর জবানবন্দী*। এসব সাহিত্যকর্মে ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সুস্পষ্ট বিরোধিতা। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধরেছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলা কাব্যে তিনি ইসলামী সংগীত তথা গজল প্রবর্তন করেন। পাশাপাশি তিনি অনেক উৎকৃষ্ট শ্যামাসংগীত ও ভক্তিগীতিও রচনা করেন। নজরুল প্রায় ৩০০০ গান রচনা এবং অধিকাংশ গানে সুরারোপ করেছেন যেগুলো এখন নজরুলসংগীত নামে পরিচিত এবং বিশেষ জনপ্রিয়। শ্যামাসংগীত রচনা প্রসঙ্গে নজরুল তাঁর শেষ ভাষণে উল্লেখ করেন, 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কোনটাই না। আমি শুধু হিন্দু-মুসলিমকে এক জায়গায় ধরে নিয়ে হ্যান্ডশেক করানোর চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।'

১৯২১ সালের এপ্রিল-জুন মাসের দিকে মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে প্রকাশক আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। তাঁর সঙ্গেই তিনি প্রথম কুমিল্লায় বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে আসেন। এখানেই প্রমীলা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, প্রণয় ও পরে বিয়ে হয়। এবছরের অক্টোবর মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

নজরুল ছিলেন সাম্যবাদের অগ্রদূত। তিনি মুসলিম হয়েও চার সন্তানের নাম হিন্দু এবং মুসলিম উভয় নামেই নামকরণ করেন। যেমন: কৃষ্ণ মুহাম্মদ, অরিন্দম খালেদ (বুলবুল), কাজী সব্যসাচী এবং কাজী অনিরুদ্ধ।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে নবযুগে সাংবাদিকতার পাশাপাশি বেতারে কাজ করার সময় তিনি আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি পিক্স ডিজিজ নামে একটি নিউরনঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে ভিয়েনার বিখ্যাত ডাক্তার হ্যান্স হফ জানান। লন্ডনের লন্ডন ক্লিনিকে এয়ার এনসেফালোগ্রাফি নামে এক এক্স-রেয়ে দেখা যায় কবির মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। ক্রমে কবি মানসিক ভারসাম্য ও বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

১৯৫২ সালে কবি ও কবিপত্নীকে রাঁচির মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। *নজরুল চিকিৎসা কমিটি* ও ভারতের তৎকালীন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কবি চার মাস রাঁচিতে ছিলেন। ১৯৫৩ সালের মে মাসে নজরুল ও প্রমীলা দেবীকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পাঠানো হয়। ব্রিটিশ চিকিৎসক রাসেল ব্রেইনের মতে নজরুলের রোগটি ছিল দুরারোগ্য– বলতে গেলে আরোগ্যাতীত। ৯ ডিসেম্বর পরীক্ষার পর ড. হফ নিশ্চিত হন যে, কবি পিক্স ডিজিজে ভুগছেন। এ অবস্থা থেকে কবিকে আরোগ্য করে তোলা অসম্ভব। ১৪ ডিসেম্বর রোম থেকে নজরুলকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় ভিয়েনায় গিয়ে ড. হফের কাছে কবির রোগের বিস্তারিত শোনেন।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। এসময় তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয়তা প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে।

জীবদ্দশায় কবি নজরুল অনেক সম্মান-পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে এবং ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। নজরুলবিষয়ক গবেষণার জন্য বাংলাদেশ সরকার নজরুল ইন্সটিটিউট নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। এবছরেরই ২৯ আগস্ট ঢাকার পিজি হাসপাতালে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নানা আয়োজন...

১৫ জুলাই ২০১৭ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় শায়লা তাসমীনের শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন

২০ জুলাই ২০১৭ ঢাকায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও গুলশান ক্লাব আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় জি বাংলা সা রে গা মা পা-এর চ্যাম্পিয়ন অন্বেষা দত্ত ও ফাইনালিস্ট অরিত্র দাসগুপ্তর নির্বাচিত বাংলা এবং হিন্দি গান পরিবেশন

২৯ জুলাই ২০১৭ ঢাকার শাহবাগে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী আব্দুল আলিমের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় শিল্পী নূরজাহান আলিম টুনির সংগীত পরিবেশনা

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra August 2017

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka